লোকজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

সুজন পাবলিকেশনস্
৭বি, লেক প্লেস
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৬৩

প্রকাশক :

তপন মুখোপাধ্যায়

সৃজন পাবলিকেশনস্

৭বি, লেক প্লেস

কলিকাতা-৭০০ ০২৯

মুদ্রণ :

সনাতন হাজরা

প্রভাবতী প্রেস

৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদে : শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের স্বহস্তে লেখা

"জয় রাধে পৃমমোহি

নরেন শিক্ষে দিবে

জখন ঘুরে বাহিরে

হাঁক দিবে জয় রাধে"

চিন্থু শাঁখারী

ধনি কামারনী

রাণী রাসমণি

নটী বিনোদিনী

এঁদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিষয়সূচী

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। মানবাত্মার অপরিসীম লাঞ্ছনায় কেঁদে উঠেছেন মানবতাবাদীরা। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে দুটি বিশ্বযুদ্ধে যে ভয়াবহ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে, যেভাবে মানুষের নগ্ন আদিম প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে-কথা কল্পনা করে শিউরে উঠেছে বিশ্ববাসী। এমনি সময় এগিয়ে এলেন তিনজন প্রখ্যাত মানবতাবাদী দার্শনিক-সাহিত্যিক—অল্‌ডাস হাক্‌সলী, ক্রিস্টোফার ঈশারউড, জেরাল্ড হার্ড। পথ কোথায়? যে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের এত গর্ব করে মানুষ, তার ভবিষ্যৎ কি? আত্মহত্যাই কি মানুষের শেষ পরিণতি? এই পথের সন্ধান তাঁরা শুধু তত্ত্বেই করলেন না, শুধু নীতিবাক্যে নয়, তাঁরা চাইলেন একটি জ্বলন্ত জীবন যিনি হবেন সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রতীক। তত্ত্ব হিসেবে খুঁজে পেলেন তাঁরা বেদান্ত দর্শনকে, আর আবিষ্কার করলেন একটি জীবন যার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েন্‌বীও বললেন একই কথা—হয় সর্বগ্রাসী ধ্বংস আর না হয় শ্রীরামকৃষ্ণের পথ, এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতেই হবে আমাদের।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে মনীষী-সাহিত্যিক-সমাজনেতা-মহাপুরুষের অভাব ছিল না। তবু আজ শ্রীরামকৃষ্ণই সবার চেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি ছিল বিস্তৃত। অথচ তিনি রাজা-রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো সমাজনেতা ছিলেন না, কেশব সেন বা প্রতাপ মজুমদারের মতো বক্তা নন, তিলক বা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মতো রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেননি, এমনকি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো কোনো মরা মানুষকেও বাঁচান নি। তবে কেন তিনি আজ ভারতে এত শ্রদ্ধেয় এত আপনজন? বুদ্ধ-যীশু-মোহম্মদের মতো কোনো রাষ্ট্রশক্তি তো তাঁকে প্রচার করতে এগিয়ে আসেনি! স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর সম্বন্ধে মাত্র দুইটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের যে প্রকাশন বিভাগের সাথে আমি গত কয়েক বছর ধরে যুক্ত ছিলাম, সেই অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশিত বইয়ের শতকরা পাঁচটিও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক নয়। তাছাড়া প্রচারের সাহায্যে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা গেলেও ম্যাকস্‌মূলার, রোমাঁ রোলাঁ, টয়েন্‌বী, অল্‌ডাস্‌ হাক্‌সলী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিনয় সরকার,

রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো লোককে নিশ্চয়ই প্রচারের শিকার করে তোলা যায় না। এঁরা কেন তাঁর অনুরাগী হয়েছিলেন? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: শ্রীরামকৃষ্ণ একটি প্রবাহ (process), এবং এই প্রবাহ আজও চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবাহের কয়েকটি দিক তুলে ধরার জন্যই এই গ্রন্থ। বাংলার এক অজ পাড়াগাঁ'র স্বল্পশিক্ষিত একজন মানুষ কেন আপামর জনসাধারণের কাছে এত বেশি শ্রদ্ধেয়, লোকজীবনে তাঁর বিস্তার কেন এতটা হয়েছে, তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই বইতে। গ্রামীণ মানুষের সাথে উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষও কেন আকৃষ্ট হচ্ছেন তাঁর প্রতি, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবাহ কিভাবে মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, ও রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, তারই একটি রূপরেখা দেবার চেষ্টা করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে বেশি গৃহীত হয়েছেন কারণ তিনি লৌকিক জীবনের খুব কাছে যেতে পেরেছিলেন: **লোকমানস ও শ্রীরামকৃষ্ণ** অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে তারই পরিচয়—লৌকিক উপমা, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, লোককথা বা কাহিনী, লোকসংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ জনগণের ধর্ম-ভাষা-জীবনযাত্রাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। একদিকে লোকচেতনার ঐতিহ্য, অন্যদিকে উন্নত সংস্কৃতির ধারা—এই দুয়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন তিনি। **নবজাগরণের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ** অধ্যায়টি শুরু হয়েছে রেনেসাঁস-ভাবনা দিয়ে। ইওরোপীয় ও ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করে অনুসন্ধান করা হয়েছে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ-দয়ানন্দ প্রমুখের সমাজ-চিন্তা ও জীবন-জিজ্ঞাসার রূপটি কি ছিল, এবং শ্রীরামকৃষ্ণই বা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন। শিক্ষিত শহুরে ভারত ও নিরক্ষর গ্রামীণ ভারতের দ্বন্দ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা জাতিকে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস্ ও ভাবাদর্শগত নিউরোসিস্ থেকে রক্ষা করেছিল। এই প্রসঙ্গের আরও বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে **প্রতীক ও লোকচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ** অধ্যায়ে। কোন্ মৌল আকৃতি থেকে মানুষ বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম-রাজনীতি-শিল্প-সাহিত্যের সমাহারে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে তার আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বজনীন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলেন। মীথোলোগ্ বিষয়টি নিয়ে পাশ্চাত্যে বহু মনীষী আজ গবেষণা করলেও ভারতে বিষয়টি খুবই নতুন। শ্রীরামকৃষ্ণের অকৈতবী দার্শনিকতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা,

তাঁর ঐতিহাসিকতা ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন, ইতিহাসের মূলসূত্র ও উপাদান ইত্যাদিকে এই মীথোলোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখানো হয়েছে কিভাবে তিনি লোকোত্তর চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে এই অধ্যায়টিকে এক নতুন দিক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস হয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন: নারীত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা শ্রীশ্রীমা। মা সারদা'র ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বিশেষ দেখা যায় না। **নারী-মানসে নতুন দিগন্ত—মা সারদা** অধ্যায়ে ভারতীয় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। মননশীলতা, তুচ্ছ আচারের বিরোধিতা, সংস্কারমুক্ত মানসিকতা, বিশুদ্ধ ধর্মের জাগরণ, নারীমুক্তির স্বরূপ, জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতা বোধ, বিস্ময়কর সমাজ-চেতনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে মা সারদা'র জীবন ও বাণীর বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে, একদিকে বুদ্ধের মতো অনন্ত করুণা ও অন্যদিকে প্রমেথিউসের মতো বিদ্রোহী চরিত্র. এই দুইয়ের মিলনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবাহের নারী-মানসে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন। স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভার মধ্য দিয়ে তাঁর 'মানুষ' রূপটি খোঁজার চেষ্টা হয়েছে **মানুষ বিবেকানন্দ** অধ্যায়ে। নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ উত্তরণের মূলে কি শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণ, অথবা বিলে'র জন্মগত বিদ্রোহী ভাব, কিংবা গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা? নিজস্ব জীবনবোধ নিয়ে কিভাবে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর গুরুকে যিনি স্বকীয় মৌলচেতনার জাগরণে নতুন চিন্তা ও কর্মের সন্ধান দিয়েছিলেন, সেই কথা রয়েছে এই অধ্যায়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের আদিপর্বে অন্যতম প্রধান নেতৃত্ব ছিল স্বামী সারদানন্দের হাতে। **একটি নেতৃত্বের বিশ্লেষণ—স্বামী সারদানন্দ** অধ্যায়ে সেই নেতৃত্বের মূল্যায়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বোঝা যাবে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনগত স্বকীয়তা। ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রের যে পরীক্ষা তিনি করেছিলেন তা শুধু অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থার পক্ষেই নয়, সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানগুলির সামনেও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। **শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য** অধ্যায়ে বলা হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরোপুরি বুঝেছি এই দাবী করি না, বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি এ-বইয়ে। এই কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর ডঃ সজল বসু। মূল পাণ্ডুলিপি পড়ে বিভিন্ন পয়েণ্টে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে,' নতুন পয়েণ্ট

জুগিয়ে দিয়ে প্রুফ দেখে, ও নির্ঘণ্ট তৈরী করে দিয়ে তিনি বন্ধুকৃত্য করেছেন। বন্ধুবর তপন মুখোপাধ্যায় তাড়া দিয়ে বইটি লিখিয়ে নিয়েছেন। সজলবাবু ও তপনবাবুর সাথে লেখকের হৃদ্যতা যে পর্যায়ে তাতে আলাদা করে ধন্যবাদ দেওয়াটা নেহাৎই লৌকিকতা। এইসাথে সুজিত নাগ, শান্তনু বসু, রমা চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী ও কৃষ্ণা রায়ের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি ভ্রাতৃপ্রতিম স্বামী দুর্গানন্দ, অঘোরানন্দ, অদ্রিজানন্দ, পরব্রহ্মানন্দ, ভবহরানন্দ ও সুপ্রসন্নানন্দকে যাদের উৎসাহ আমায় ঘিরে ছিল বইটি লেখার সময়। প্রচ্ছদশিল্পী জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেসের কর্মীদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

প্রথম অধ্যায় ঃ লোকমানস ও শ্রীরামকৃষ্ণ

সামগ্রিকভাবে জীবজগতের মাঝে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার নিয়ম দেখা গেলও মানবসমাজের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেটি হল ভাব বিনিময়ের নিয়ম। এই বৈশিষ্ট্যটি মানবসমাজে সংস্কৃতি নামে একটি আলাদা শক্তির সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ যখন কুটির বেঁধে বসবাস করা শুরু করে, তখন থেকেই জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-উৎসব ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধি নিষেধগুলি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবর্তন এলেও দেখা গেছে যে বহুকাল ধরে একটি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও আচরণের যে ধারা তৈরী হয়েছে সেটির রেশ থেকে যায় পরবর্তীকালে এবং সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমাজের একজন হয়ে ওঠে। প্রাথমিক স্তরের প্রথা, বিশ্বাস, জ্ঞান, ভাষা ও শিল্পগত ধারাকে আশ্রয় করে যে জীবন-সম্পর্কীয় ধারা গড়ে ওঠে, সেটিই হল ধর্মের লৌকিক ঐতিহ্য। পরে উদ্ভব হয় ধর্মের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ধারা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন উন্নত আবিষ্কার যেমন কোন-না-কোন ব্যক্তিমানুষের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (যেমন নিউটন, এডিসন, আইনস্টাইন, রমন প্রমুখ), ধর্মের উন্নত স্তরের ক্ষেত্রেও সে-রকম। এঁদেরই বলা হয় মহাপুরুষ, সন্ত, অবতার ইত্যাদি। যে সন্ত যত বেশি লৌকিক জীবনের কাছাকাছি, লোকজীবনের থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাখ্যায় এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করতে পেরেছেন, তিনি মানুষের কাছে তত বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য এ-কারণেই মানব সমাজে সহজেই গৃহীত হয়েছেন। তাঁদের জীবন মিথ হয়ে উঠেছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী, মাদাম ব্লাভাটস্কি, ত্রৈলঙ্গস্বামী, কেশব সেন প্রমুখ ধর্মনায়কেরা আবির্ভূত হলেও এঁদের সবার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে আজ বেশি গৃহীত হয়েছেন, তার অন্যতম কারণ তিনি ভারতীয় লৌকিক জীবনের খুব কাছে যেতে পেরেছিলেন। ভারতীয় জীবনদর্শন, ধর্মসাধনা তথা উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে লৌকিক জীবনচর্চা, ধ্যানধারণা, সংস্কার-বিশ্বাসের একটা ভাবমাধ্যম

হতে পেরেছিলেন, উচ্চতর দার্শনিক ও ধর্মীয় উপলব্ধিকে লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর তত্ত্বচিন্তা প্রকাশ করার সময় সাহায্য নিতেন লৌকিক জীবনবোধ ও লৌকিক উপমার। ফলে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর কখনও প্রজন্মগত ব্যবধান বা জেনারেশন গ্যাপ দেখা দেয়নি, যে ব্যবধান তৎকালীন বহু ধর্মনেতার মধ্যেই দেখা গেছে।

লৌকিক উপমা, লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার, এবং লোককাহিনী—এগুলির আশ্রয় নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

লৌকিক উপমা

কিভাবে সংসারে থাকতে হয়, মানুষের মনের অবস্থা কি, যোগ কাকে বলে, সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ কি, মায়া কি—এসব উচ্চমার্গের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে উপাদান ব্যবহার করেছেন তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রী। ছোট ছোট ছবি এঁকেছেন এমন ভাষায় মাধ্যমে যা একান্তভাবে ঘরোয়া ভাষা। প্রথমেই ধরা যাক "কিভাবে সংসারে থাকতে হয়" এ-প্রসঙ্গে তার কয়েকটি উক্তি—

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

"ইট বা টালি যদি কোন ছাপশুদ্ধ পোড়ানো হয় ত পোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তিলাভ করে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক তাহলে সে ভক্তি চিরকাল থাকবে। কামকাঞ্চন তোমাদের একেবারে ডুবিয়ে ফেলতে পারবেনা।"

"লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ি ছুঁলে চোর হয় না। সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ি ছুঁয়েছে তাকে আর চোর করবার যো নেই। সংসারে সেই রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করে না।"

তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙা, ছাপ দিয়ে ইট পোড়ানো, লুকোচুরি খেলা—

বাংলার গ্রামীণ জীবন থেকে বেছে নিলেন উপমা। আবার ইংরেজ সভ্যতার অবদানে শহুরে জীবনের আসবাবপত্রে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তা-ও তাঁর নজর এড়ায়নি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যেমন গ্রামের মানুষ আছে, তেমনি আছে শহরের মানুষ। 'মনের অবস্থা কি' বোঝাবার জন্য তিনি বেছে নিলেন শহুরে আসবাবপত্র—"মন কেমন জান? যেমন স্প্রিং-এর গদী। যতক্ষণ গদীর উপর বসে থাকা যায় ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সৎ ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করামাত্র যে কে সেই—আবার পূর্বভাব ধারণ করে।" ঈশ্বর তো মানুষকে ভালবাসেন। তবে মানুষ কেন ভগবানের দিকে যায় না? বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"ছুঁচে যদি মাটি মাখা থাকে চুম্বক টানে না—মাটি সাফ করে দিলে আবার টানে। কামিনী কাঞ্চন মাটি পরিষ্কার করতে হয়। তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো—সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে মুছে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে নেবে। যোগ তবেই হবে।" কিন্তু যোগ কি? আবার উপমা—"দীপ-শিখা দেখোনি? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মতো—যেখানে হাওয়া নাই। মনস্থির না হলে যোগ হয়না। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়। মনটি কতক দিল্লী, কতক ঢাকা, কতক কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করে পরমাত্মাতে স্থির করতে হবে।" যোগের অবস্থা বোঝাতে যেমন গ্রামীণ উপমার সুন্দর ব্যবহার করেছেন, তেমনি শহুরে উপমাও বাদ দেননি—"ঠিক দুপুরে ঘড়ির দুটো কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়—ঠিক যোগ হলে সেইরূপ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এক হয়ে যায়।"

বদ্ধ জীব কেমন? দুঃখ-কষ্ট পেয়েও যে মানুষের মনে জীবনজিজ্ঞাসা জাগেনা, পুনঃপৌণিকতার ভারে যাদের জীবন বিপর্যস্ত তাদের অবস্থা বোঝাচ্ছেন দুটি উপমা দিয়ে—একটি পশুজগতের, অন্যটি মানুষের। "মানুষের ভিতরে দেখ, বদ্ধ জীবই বেশি। এত দুঃখ-কষ্ট পায়, তবু সেই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখে দরদর করে রক্ত পড়ে, তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, ওগো, আর স্বামীর কাছে যাব না; আবার ভুলে যায়।"

সব ধর্মের প্রতি উদার ভাব রেখেও নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা রাখতে হয়, এ-কথা বোঝাতে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনের উপমা দিচ্ছেন—"একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি। শ্বশুর, শাশুড়ী, দেওর, ভাসুর সবাইয়ের সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, আসন দেয়, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে সেরূপ সেবা আর কাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। সবাইকে প্রণাম করবে, কিন্তু একটির উপর প্রাণঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।"

কেশব সেনকে ভালবাসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বলেছিলেন "কেশব, তোমার ল্যাজ খসেছে।" কথাটা শুনে কেশব সেনের অনুরাগীরা কেউ অবাক হয়েছিলেন, কেউবা ক্রুদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন নিজেই ব্যাখ্যা করলেন কথাটির—"যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙাতে উঠে। তখন সে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। তেমনি যতদিন মানুষের অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার জলে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান লাভ হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারবে, আবার ইচ্ছে করলে সংসারেও থাকতে পারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অসংখ্য উপমা ব্যবহার করেছেন, সহজভাবে বুঝিয়েছেন নানান তত্ত্বকথা। কিন্তু একটি বিষয় বোঝাতে পারেননি—ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি কেমন। বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন "ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট"। এই না-বলা কথাতেও তাঁর উপমা—"পূর্ণজ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়।…বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় করে তর্ক করে। শেষ হলে চুপ হয়ে যায়। কলসী পূর্ণ হলে…আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা-প্রয়োগ দেখে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে কালিদাসের পর্যায়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণই বড। মুজতবা আলীর ভাষায়—"এঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) মতো সরল ভাষায় কেউ কখনো কথা বলেনি। এঁর ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য খ্রীষ্টের ভাষা ও বাক্যভঙ্গির। আমাদের দেশের এক আলঙ্কারিক বলেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য।' এর অর্থ শুধু এই নয় যে, কালিদাস উত্তম উপমা প্রয়োগ করতে পারতেন—এর অর্থ, উপমামাত্রই কালিদাসের, অর্থাৎ উপমার রাজ্যে কালিদাস একচ্ছত্রাধিপতি। আমার মনে হয়, উপমাবৈচিত্র্যে পরমহংসদেব

কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন। কালিদাস ব্যবহার করেছেন শুধু সুন্দর মধুর তুলনা—যেগুলো কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। রামকৃষ্ণের সেখানে কোনো বাছবিচার ছিল না। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—'তার জাঁতায় যাই ফেলো না কেন, ময়দা হয়ে বেরিয়ে আসে।' পরমহংসের বেলাও ঠিক তাই। কিছু একটা দেখলেই হল, সময়মতো ঠিক সেটি উপমার আকার নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এমন কি যেসব কথা আমরা সমাজে বলতে কিন্তু কিন্তু করি, পরমহংসদেব সর্বজনসমক্ষে অক্লেশে সেগুলো বলে যেতেন।··· এইখানেই আমরা একটি মূল সূত্র পাবে। জনগণের ধর্ম (ফোক রিলিজিয়ন), আচার-ব্যবহার, ভাষা—সব জিনিসকেই তার চরম মূল্য দেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর বলেই জনগণের ভাষা, বাচনভঙ্গি সানন্দে ব্যবহার করে যেতেন। জনগণের অন্যায় অধর্ম তিনি স্বীকার করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই তথাকথিত স্ল্যাঙ-শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সেই শব্দগুলিতে পাঠক তাঁকে যেন আরও আপন করে পায়। একজন ধনী লোককে উদ্দেশ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—"ধনীলোক দেখলেই সব মোসাহেব এসে জোটে। যেমন মরা গরু পেলে যত শকুনি এসে পড়ে। ওদের কথায় ভুলো না। মোসাহেবেরা সব কথাতেই 'আজ্ঞা হাঁ, অতি চমৎকার।' আবার বলবে 'আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী।' বলা ত নয়, অমনি বাঁশ।" বাঁশ শব্দটির এমন অপূর্ব প্রয়োগ—এটি শ্রীরামকৃষ্ণেই সম্ভব।

লৌকিক উপাদান দিয়ে উপমায় প্রয়োগ করে তিনি যেমন নানান উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি শাস্ত্রের বাণীগুলি বুঝিয়েছেন স্বকীয় প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শনে। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। সংসারের কর্তব্য করার সাথে ঈশ্বরেও মন রাখা উচিত, এ-কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলছেন, সবসময় আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধ করো—"সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ" (৮:৭)। কিভাবে তা করা যায়, বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ লৌকিক জীবন থেকে তুলে নিয়ে এলেন একটি সুন্দর ছবি—"ও-দেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকি দিয়ে চিঁড়ে কাড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকি টেপে, আর একজন নেড়ে-চেড়ে দেয়। সে হুঁস রাখে যাতে ঢেঁকির মুসলটা হাতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা হচ্ছে, 'তোমার কাছে এত বাকি পাওনা আছে, দিয়ে যেও।' ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে

নানা কাজ করতে পারো। কিন্তু অভ্যাস চাই। আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই।" কিংবা ধরা যাক গীতার আরেকটি শ্লোক (৬:২২)—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ / যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—যা লাভ করে [যোগী] অন্য কোন লাভকেই বড় বলে মনে করেন না, যে [অবস্থায়] স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। এই অবস্থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ এককথায় প্রকাশ করেছেন—"ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়।···কামারের নেয়াই, তার উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়ছে, কিছুতেই কিছু হয়না।"

সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্ব বোঝাবার জন্যে পুরুষ ও প্রকৃতির অবতারণা করা হয়েছে। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তার সান্নিধ্যে জড় প্রকৃতি কাজ করে। চুম্বক ও লোহার উদাহরণ দিয়ে শাস্ত্রকারেরা ওই তত্ত্ব বুঝিয়েছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ তা বুঝিয়েছেন তাঁর স্বভাবসুলভ মৌলিক উপমা দিয়ে—"ওই যে গো দেখনি, বে-বাড়িতে? কর্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টানছে। গিন্নী কিন্তু কাপড়ে হলুদ মেখে একবার এখানে একবার ওখানে বাড়িময় ছুটোছুটি করে এ-কাজটা হল কিনা, ও-কাজটা করলে কিনা, সব দেখছেন শুনছেন, বাড়িতে যত মেয়েছেলে আসছে তাদের আদর অভ্যর্থনা করছেন আর মাঝে মাঝে কর্তার কাছে এসে হাতমুখ নেড়ে শুনিয়ে যাচ্ছেন—'এটা এইরকম করা হল, ওটা এইরকম হল, এটা করতে হবে, ওটা করা হবে না' ইত্যাদি। কর্তা তামাক টানতে টানতে সব শুনছেন আর হুঁ হুঁ করে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্চেন। সেইরকম আর কি!"

একই সত্যকে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করছে। এটি বলতে গিয়ে ঋকবেদে বলা হয়েছে (১:২২:১৬৪:৪৬)—"ইদং মিত্রং বরুণ মগ্নিমাহু-রথোদিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরি-শ্বানমাহুঃ।" আর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা—"বাড়ীর মধ্যে একজন রয়েছেন। বাইরে থেকে তাঁকে কেউ খুড়োমশাই, কেউ মামাবাবু, কেউ মেশোমশাই বলে ডাকছে! কিন্তু তিনি ভেতর থেকে বুঝতে পারছেন যে সকলে তাঁকেই ডাকছে। ভগবানও সেইরূপ।···তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে।"

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে প্রখ্যাত গবেষক আবদুল হাফিজ লিখেছেন, "একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ তা লোকবিশ্বাসই বটে। কিন্তু যে মুহূর্তে তা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, যূথবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপে যখন যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে, তখন তা পরিণত হয় লোকসংস্কারে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে বিভিন্ন ধরণের লোকসংস্কারের পরিচয় মেলে। এগুলিকে তিনি দুইভাবে ব্যবহার করেছেন। আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক কোন তত্ত্বকে সহজভাবে বোঝাত গিয়ে, এবং রসিকতা করার সময়। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা-কাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের লোকসংস্কার তিনি ব্যবহার করেছেন। প্রথমে রসিকতার কথাই ধরা যাক। এক অল্পবয়সী যাত্রা-অভিনেতার সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হচ্ছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ : তোমার কি বিবাহ হয়েছে ? ছেলেপুলে ?

অভিনেতা : আজ্ঞা একটি কন্যা গত ; আরো একটি সন্তান হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ : এর মধ্যে হলো, গেল ! তোমার এই কম বয়স। বলে— 'সাঁজ সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত'।

আবার মানুষের নির্বোধ অজুহাত শুনে হেসে শোনাচ্ছেন একটি গ্রাম্য ছড়া—"দক্ষিণে কলাগাছ, উত্তরে পুঁই, / একলা কাল বিড়াল কি করব মুই !" লক্ষ্য করুন, লোকসংস্কারের অশুভ লক্ষণগুলি। আবার একজন সাধন-ভজন না করেই মানুষের কাছে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দেয়। তার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে আরেকটি ছড়া—"মন্দিরে তোর নাহিক মাধব / পোদো, শাঁক ফুঁকে তুই করলি গোল ! / তায় চামচিকে এগারো জনা / দিবানিশি দিচ্ছে হানা—।" ছড়ার তাৎপর্য তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর কয়েকজন শহরবাসী অনুরাগীর কাছে—"এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছোকরা ছিল। সবাই তাকে পোদো বলে ডাকত। গ্রামে একটি পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর বিগ্রহ নাই—মন্দিরের গায়ে অশ্বত্থ গাছ। অন্যান্য গাছপালা হয়েছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকা বাসা করেছে। মেজেতে ধুলো ও চামচিকার বিষ্ঠা। মন্দিরে লোকজনের আর যাতয়াত নাই। একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনতে পেলে। মন্দিরের দিক

থেকে শাঁক বাজছে ভোঁ ভোঁ করে।...সকলে দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত।.. তাদের মধ্যে একজন মন্দিরের দ্বার আস্তে আস্তে খুলে দেখে পদ্মলোচন একপাশে দাঁড়িয়ে শাঁক বাজাচ্ছে। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই—মন্দির মার্জনা হয় নাই। তখন সে চেঁচিয়ে বলছে...'মন্দিরে তোর নাহিক মাধব...'।" ছড়াটি এবং তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুঁকলে কি হবে! আগে চিত্তশুদ্ধি কর।...চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যায় না। (এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তারপর ইচ্ছা হয় বক্তৃতা লেকচার দিও।")

ছড়ার সাথে সাথে প্রবাদও ব্যবহার করেছেন তিনি, যেমন, কুমড়ো-কাটা বড়্‌ঠাকুর'। শহুরে এক ভদ্রলোককে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—"সে কি? তুমি যে কুমড়োকাটা বড়্‌ঠাকুর হলে! তুমি না সংসারী, না হরিভক্ত।.. এক একজন বাড়িতে পুরুষ থাকে—মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে বসে ভুড়ুর ভুড়ুর করে তামাক খায়, নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বড়্‌ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দুখানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের ব্যবহার।"

সামান্য লোকের টাকার অহংকারকে বলা হয় ব্যাঙের আধুলি। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য ব্যবহার করেছেন 'ব্যাঙের টাকা থাকা' বাক্যটি। তিনি যে শুধু গ্রামীণ লোকসংস্কারের কথাই ব্যবহার করেছেন তা নয়, শহরের আধুনিক জীবনেও যে নতুন ধরণের লোকসংস্কার গড়ে উঠেছে সে বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এরকম একটি বিশ্বাস—কাগজের খবরের গুরুত্ব বৃদ্ধি। এ-প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "একজন এসে বললে, ওহে! ওপাড়ায় দেখে এলুম অমুকের বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বললে, সে ইংরাজী লেখা-পড়া জানে। সে বললে, দাঁড়াও একবার খপরের কাগজ-খানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, ওহে তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। কই বাড়ি ভাঙ্গার কথা তো খপরের কাগজে লেখে নাই। ওসব মিছে কথা।"

এবারে দেখা যাক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কি কি লোকসংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে তাঁর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি এগুলি উপমা হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। যেমন কাকে-ঠোকরানো আম ঠাকুরসেবায় লাগেনা, দৈ-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে নেই, কাজলের ঘরে থাকলে কালি লাগবেই ইত্যাদি। এগুলিকে লোকসংস্কার বললেও কুসংস্কার বলা যায় না। আবার কতকগুলি লোকসংস্কার তিনি উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন যেগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা সন্দেহ, যেমন ব্যাঙের মাথা পুড়িয়ে কাজল তৈরী করে চোখে দিলে চারদিকে সাপ দেখা যায়; পারার মধ্যে বহুদিন সীসে (lead) থাকলে পারা হয়ে যায় ইত্যাদি। আরেক ধরণের লোকসংস্কার, যাকে গ্রামে টোটকা চিকিৎসা হিসেবে কাজে লাগানো যায় তার উল্লেখও তিনি করেছেন, যেমন পীলে বড় হলে মনসার পাতা ব্যবহার করা। আবার লোকাচারের উল্লেখও আছে, যেমন বিয়ের সময় হাতে ছুরি ও যাঁতি থাকা। এ-রকম বিভিন্ন ধরণের লোক-সংস্কার ব্যবহারের মধ্যেই বোঝা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ লোকজীবনের কতখানি কাছাকাছি ছিলেন। উপমা হিসেবে তিনি কিভাবে এগুলিকে ব্যবহার করেছেন ?

"রসুনের বাটি যত ধোও না কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। ছোকরারা শুদ্ধ আধার; কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করে নাই। অনেকদিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়। যেমন কাকে ঠোকরানো আম। ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ। নূতন হাঁড়ি আর দই-পাতা হাড়ি। দই-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়। প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়।"

"অনুরাগ অঞ্জন। শ্রীমতী বলছেন, 'সখি চতুর্দিক কৃষ্ণময় দেখছি!' তারা বললে, 'সখি অনুরাগ-অঞ্জন চোখে দিয়েছ তাই ঐরূপ দেখছো!' এরূপ আছে যে, ব্যাঙের মুণ্ডু পুড়িয়ে কাজল তৈয়ার করে সেই কাজল চোখে দিলে চারিদিক সর্পময় দেখে।"

"ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। ...শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হ্রদে সীসে অনেকদিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুরেপোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুমুরেপোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে (ঈশ্বরকে) ভেবে ভেবে অহংশূন্য

হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি'।"

"কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগবেই।"

"তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পিলে মুখ তুললে পর মনসার পাতা-টাতা দিতে হয়।"

"মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলা দেশে জাঁতি থাকে। অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে।...কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই, বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক।"

জীবের অহংকার আছে বলে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।.. তবে 'বালকের আমি' (বাচ্চা ছেলের ছেলেমানুষী গর্ববোধ) এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে অসুখ হয়, কিন্তু হিঞ্চেশাক খেলে উপকার হয়। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে কফ-দোষ করে না।"

বিভিন্ন ধরণের লোকবিশ্বাস বা লোকসংস্কারের কথা তাঁর কাছে শোনা গেলেও গ্রামীণ লোকসংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক—যাদুবিদ্যা বা তুকতাক্ ধরণের কোন কথা, ছড়া বা বিশ্বাস তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিশেষ করে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, রোগ ভাল করা, সাপে কাটা বা ভূত ছাড়ানোর কোন মন্ত্র তাঁর মুখে তো শোনা যায়ই নি, বরং এগুলির ওপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন দেখা যায়। তার কারণ কি তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

লোককথা বা লোককাহিনী

ইংরেজীতে যাকে folk tale বলা হয়, বাংলাতে তার নাম লোককথা বা লোককাহিনী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোককথা' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী (বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৯৫৭, পৃঃ ৩৯৭), কিন্তু আবদুল হাফিজ 'লোককাহিনী' শব্দটিই পছন্দ করেন

শ্রীরামকৃষ্ণ একজন অসাধারণ কথক ছিলেন। কেবল কথামৃতেই আমরা একশটির বেশি গল্প পাই তাঁর মুখে। এ-ছাড়াও অন্যান্য প্রামাণিক বইয়ে তাঁর

বিভিন্ন গল্প ছড়ানো আছে। এই গল্পগুলির মধ্যে তাঁর জীবনের ঘটনা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে অসংখ্য লোককাহিনী। লোককাহিনী সম্বন্ধে আবদুল হাফিজের মত হলো—"লোককাহিনী বলতে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে তা পুরুষ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ এবং লিখিত বা মৌখিক গদ্যের ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়" (ঐ, পৃঃ ৩)। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি ছোটবেলা থেকেই অসংখ্য গল্প জেনেছেন ও পড়েছেন। যে-সব গল্প তিনি বলেছেন, তার মধ্যে লোককাহিনীগুলিকে যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করি তবে সেই আলোচনার জন্য একটি আলাদা বই লেখার প্রয়োজন হবে। এখানে তাই আমরা খুব সংক্ষেপে তাঁর বলা লোককাহিনীর একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। (কাহিনীগুলির পাশে ব্র্যাকেটে দেওয়া সংখ্যা হল কথামৃতের আকর নির্দেশ, অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের কোন্ জায়গায় গল্পটি রয়েছে। যেমন ৩:১৭:৪-এর অর্থ—কথামৃতের ৩য় ভাগ, ১৭ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, লোককাহিনীগুলি যদিও 'পুরুষপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ' তবুও একই গল্প বিভিন্ন কথকের মুখে বিভিন্ন রূপ ও তাৎপর্য পায়।

বিশেষজ্ঞেরা লোককাহিনীর যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বলা গল্পগুলির মধ্যে তার প্রায় সব কটিই দেখা যায়। নীচে আমরা এর কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

(১) **রূপককাহিনী** (Fairy tales)—ভূতের চুল সোজা করা (৩:১৭:৪), গভীর বনে শবসাধনা (১:৪:১)।

(২) **রোমাঞ্চকর কাহিনী** (Novella)—স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল (১::৩: ৩, ৩:১৭:৪)।

(৩) **স্থানিক কাহিনী** (Legends)—জটিল বালকের দাদা মধুসূদন (২:১২:২), ভূকৈলাসের সাধু (২:৭:২)।

(৪) **পুরাণ কাহিনী** (Myths)—রাবনের জন্ম ও বধ হওয়া (৩:১৭:২), মার ভিতরে গণেশের ব্রহ্মাণ্ড দেখা (৪:৯:২)।

(৫) **পশু-পাখীর কাহিনী** (Animal tales)—ব্যাঙের টাকা হওয়া (১:৪:৬), পম্পা সরোবরে রাম ও ব্যাঙ (৩:১০:১)।

(৬) **নীতি-কাহিনী** (Fables)—ছাগলের পালে বাঘ পড়া (২:৬:৯) বলদের পেছনে শেয়াল (৫:১২:২), চিলের মুখে মাছ (১:৮:৩)।

(৭) **হাস্যরসাত্মক কাহিনী** (Anecdotes)—নাপিত ও ড্যাম্ (৫:ক :১), ভক্ত হিন্দুর আল্লা নাম (৩:৯:৫), পাহাড়ের উপর কুঁড়ে ঘর (১:১০:৭)।

(৮) **ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী** (Explanatory tales)—হালদার-পুকুরের পাশে মানুষের পায়খানা করা বন্ধ হওয়া (১:২:৮), বারশো নেড়া তেরশো নেড়ী (১:৪:৪) গল্পগুলিকে ধরা যেতে পারে।

(৯) **বীর কাহিনী** (Hero tales)—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত লোককাহিনীর মধ্যে এর নিদর্শন পাওয়া না গেলেও তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়—তোতাপুরী ও ভৈরব (লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ২৪৭), তন্ত্রসাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা (ঐ, সাধকভাব, পৃঃ ২১১-১৪) ইত্যাদি।

(১০) ও (১১) **সূত্রধারী কাহিনী** (Formula tales) এবং **ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী** (Cumulative tales)—এ ধরণের কোন গল্প তাঁর কাছে শোনা যায়নি। ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়ানোর জন্য কিংবা engaged করে রাখবার জন্য এই গল্পগুলি।

এবারে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় কয়েকটি গল্প শোনা যাক। এতেই বোঝা যাবে তাঁর গল্প বলার বৈশিষ্ট্য। প্রথমেই একটি হাসির গল্প নেওয়া যাক।

"শুনো একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে লোকটি ড্যাম্ (damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলেঃ তুমি আমায় ড্যাম্ বললে, এর মানে কি, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস্। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম্ মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম্, আমার বাপ ড্যাম্, আমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম্। আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্, তোমার চৌদ্দ পুরুষ ড্যাম্। আর শুধু ড্যাম্ নয়। ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যা ড্যা-ড্যাম্ ড্যাম্।

"এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে। সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে যতক্ষণ না জল আসে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ খানা খুঁড়ে

যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হলো। গৃহিনী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে—'বাবা! বেলা হয়েছে,তেল মেখে নেয়ে ফেল'; সে বললে 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর একটা হলো, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নাই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি! না হয় কাল করবে, কি খেয়ে-দেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া করলে; আর বললে, 'তোর আক্কেল নাই? বৃষ্টি হয় নাই। চাষবাস কিছুই হলো না, এবার ছেলেপুলে কি খাবে? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মাঠে আজ জল আনবো তবে আজ নাওয়া-খাওয়ার কথা কবো।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন একধারে বসে দেখতে লাগলো যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'নে এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ।' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগলো।…আর একজন চাষা—সেও মাঠে জল আনছিল। তার স্ত্রী যখন গেল আর বললে, 'অনেক বেলা হয়েছে এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই।' তখন সে উচ্চবাচ্য না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে—'তুই যখন বলছিস তো চল্।' সে চাষার আর মাঠে জল আনা হলো না।"

গল্প বলার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য—উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা। বাবু-চরিত্রের বর্ণনায় বলছেন—"যেমন কোন ফিটবাবু, পান চিবুতে চিবুতে ষ্টিক (stick) হাতে করে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ীর ঈশ্বরভাব ক্ষণিক, যেন তপ্ত লোহার উপর জলের ছিটে।' বাবুর বর্ণনায় পান চিবুতে চিবুতে ব্যঞ্জনাময়। সেইসঙ্গে ষ্টিকের বদলে 'লাঠি' এবং বিউটিফুলের বদলে 'সুন্দর' শব্দ ব্যবহার করলে বাবুর চরিত্র ততটা তীক্ষ্ণ হয়ে ফুটে উঠত না।

উপমার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্রাট—একথা আমরা আগেই জেনেছি। কৃপনের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "সেদিন জয়গোপাল এসেছিল… গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরৎ ঘোড়া, মেডিক্যালকলেজের হাসপাতাল ফেরত দ্বারবান—আর এখানের জন্ত নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।"

শাস্ত্রীয় কাহিনীগুলি লোককথার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে—এই উদাহরণ বিভিন্ন দেশেই দেখা গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে গল্পগুলি বলেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু শাস্ত্রীয় কাহিনী। কিন্তু তিনি যখন গল্পগুলি বলতেন, অনেক সময়ই এগুলির পরিবেশ ও চরিত্রগুলিতে ছাপ পড়ত সমকালীন যুগের। এ-ধরণের কিছু উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে কিভাবে শাস্ত্রীয় কাহিনীগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের বলার গুণে লোককাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকা অধ্যায়ের একটি সূত্র 'রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপ-দেশাৎ' (কপিল মুনির রচিত)। রাজপুত্র তত্ত্ব বা সত্য জেনে ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করেছিল—এই গল্পের সূত্র রয়েছে এখানে। এক রাজপুত্রকে খুব অল্প বয়সেই এক ব্যাধ তার বাড়িতে নিয়ে পালিয়ে যায়। ব্যাধের সমাজে বাস করে রাজপুত্র নিজেকে ব্যাধ বলেই ভাবত। এইভাবে সে যখন বড় হল তখন রাজার এক কর্মচারী সেই ব্যাধরূপী রাজপুত্রের কথা জানতে পেরে তাকে রাজপ্রসাদে নিয়ে আসে এবং সব কথা বলে। এভাবে সে নিজের সঠিক পরিচয় পায়। এই গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বললেন তখন কিছু পরিবর্তন দেখা গেল—ব্যাধের জায়গায় ছাগল, রাজপুত্রের জায়গায় বাঘের বাচ্চা, আর কর্মচারীদের বদলে বাঘ। ব্যাধের প্রসঙ্গ একবার এসেছে কিন্তু সামান্যভাবে, অন্যত্র নেই। গল্পটা (কথামৃত ৪: ৮: ২, ২: ৬: ৩) শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: "একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল, ছানাটি ছাগলের সঙ্গে মানুষ হতে লাগল। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও 'ভ্যা ভ্যা করে, সেও 'ভ্যা ভ্যা' করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হল। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়ল। সে ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক! তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে। সেটাও 'ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল। বললে, দেখ, জলের ভিতর তোর মুখ দেখ, ঠিক আমার মত, দেখ। আর নে খানিকটা মাংস—এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগল। সে কোন মতে খাবে না—'ভ্যা ভ্যা' করছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নূতন বাঘটা বললে, এখন বুঝেছিস, আমিও যা তুইও তা; এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।"

কিংবা ধরা যাক ভাগবতের একটি গল্প (১১: ৯: ২)—'মুখে করে মাংস

নিয়ে যাচ্ছে একটি বাজ পাখি। তাই দেখে [মাংসের লোভে] মাংসহীন অন্যান্য পাখিরা তাকে মারতে ছুটল। তখন বাজপাখীটি মাংসের টুকরো ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প বলার সময় বাজপাখির জায়গায় চিল আর অন্যান্য পাখির জায়গায় এল কাক। (দ্রষ্টব্য 'চিলের মুখে মাছ' গল্পটি। কথামৃত ১ঃ ৮ঃ ৩, ৫ঃ ১৫ঃ ১, ৫ঃ ১৫ঃ ৩)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬ঃ৮) একটি গল্পের উৎস পাওয়া যায়—"দড়িতে বাঁধা শকুনি বিভিন্ন দিকে উড়ে গিয়ে নিস্তার না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধন স্থানেই ফিরে আসে…।" শ্রীরামকৃষ্ণের বলা গল্পটিতে কি রকম পরিবর্তন এসেছে দেখুন—"একটি পাখি জাহাজের মাস্তলে অন্যমনস্কে বসে ছিল। জাহাজ ডাঙ্গার ভিতরে ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখির চটকা ভাঙ্গলো, সে দেখল চতুর্দিকে কূল-কিনারা নাই। তখন ড্যাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে উড়ে গেল, অনেক দূরে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তার কূল-কিনারা দেখতে পেল না। তখন কি করে, ফিরে এসে আবার মাস্তলে বসল। অনেকক্ষণ পরে পাখিটা আবার উড়ে গেল—এবার পূর্বদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখতে পেল না, চারিদিকে কেবল অকূল পাথার। তখন ভারী পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণদিকে গেল, এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন সেই মাস্তলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল।"

ব্রহ্মজ্ঞান হলে মানুষ চুপ করে যায়। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (২ঃ ১৭) লিখেছেন, "তিনি যখন প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে, সে তখন চুপ করে গেল। দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও যখন তিনি একই প্রশ্ন করলেন, সে চুপ করে রইলো। এই ব্রহ্ম বা আত্মা শান্ত।" পঞ্চদশীতে বলা হয়েছে এই আত্মাকে নেতি-নেতি (ইনি এ-রকম নন, ইনি ঐরকম নন) করে প্রকাশ করতে হয়। (পঞ্চকোশ বিবেকঃ, ৩২) এই দুটি উক্তি এবং প্রথম উক্তির মধ্যে যে গল্পের সূত্র দেওয়া আছে, তা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে পরিণত হল একটি ছোট গল্পে—"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত, বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ওই মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে—না। আরেক

জনকে দেখিয়ে বলছে,—ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও বললে না, কেবল একটু ফিক্ করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কেরা বুঝল যে ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ।"

শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প বলার বৈশিষ্ট্যই হল, সমকালীন পরিবেশ ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলা। লোকজীবন সম্পর্কে গভীর অনুভব না থাকলে এটি সম্ভব নয়। যাদের কাছে গল্প বলছেন তাদের মানসিকতা বুঝে সামান্য অদল-বদল ঘটিয়ে গল্পটিকে আধুনিক করে তোলা লোককাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে—এটিই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

লোকগীতি-লোকসংগীত

বাংলার প্রধান ৯৮টি লোকসংগীতের (বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য—আবদুল হাফিজ, ঢাকা ১৯২৩, পৃঃ ৩১-৮) মধ্যে মোটামুটিভাবে ১৬টি বিশুদ্ধ ধর্মীয়, ১৪টি ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক, ৪৩টি যাদুভিত্তিক এবং ২৫টি ধর্মনিরপেক্ষ গান। রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে, কীর্তন লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়ে না কারণ এতে রাগসংগীতের ধরণ বেশি (বাংলার লোকসংগীত, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা ১৯২৩, পৃঃ ১২৩) এবং বাউল গান ইন্‌টেলেকচুয়াল হলেও লোকসংগীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কুশলী গায়ক ছিলেন। অসংখ্য গান তিনি গেয়েছেন। তাঁর গাওয়া যে-সব গানের খোঁজ পাওয়া যায় তার মধ্যে শতকরা ১৮টি কীর্তন, ১৬টি বাউল, ৩৩টি শ্যামাসংগীত, এবং ৩৩টি অন্যান্য দেব-দেবী ও নিরাকার সংগীত। অধিকাংশ বাংলা গান, তবে কিছু হিন্দি ভজনও আছে। শ্যামা-সংগীতের মধ্যে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানই তিনি বেশি গাইতেন। রামপ্রসাদী অধিকাংশ গানই বাউল ধরণের। আর কমলাকান্তের গানে টপ্পার যে ধরণ তা তাঁর নিজস্ব প্রয়োগ। কীর্তনে রাগসংগীতের ধরণ থাকলেও এর সরল ভাষা ও মর্মস্পর্শী আবেদনের জন্য এটি সহজেই বাংলার গ্রামে ছড়াতে পেরেছে। তাই এটিকেও আমরা লোকসংগীতের পর্যায়ে ফেলতে পারি। আর বাউল গান তো লোকসংগীতই। শ্রীরামকৃষ্ণ নানারকম বাউল গান গেয়েছেন—"ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ সাগরে আমার মন" থেকে "কালো

বেড়ালকে পুষেছে পাড়াতে” পর্যন্ত। আর যাঁদের গান গেয়েছেন তিনি তাঁরা হলেন দাশরথি রায় (বিখ্যাত পাঁচালিকার ও গায়ক), নরেশচন্দ্র, রাজা নরচন্দ্র, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (নববিধান-ব্রাহ্মসংগীত রচয়িতা), রঘুনাথ রায়, মহারাজ নন্দকুমার, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, গোবিন্দ অধিকারী প্রমুখ। এছাড়া হিন্দী ভজন গাইতেন যেগুলির রচয়িতা কবীর, মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাস প্রমুখ। এই গানগুলিতে রাগ ও পরিশীলনের ছাপ থাকলেও হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এর আবেদন ও প্রচার। তাই ব্যাকরণগতভাবে লোকসংগীত না হয়েও চরিত্রের দিক থেকে এগুলিও লোকসংগীতের পর্যায়ে পড়ে।

যুগ-যুগ ধরে যে লোকসংগীতগুলি চলে আসছে বাংলার গ্রামে-গ্রামে, সেই জারী গান, বোলান, সত্যপীরের গান, ভাড় গান, ঝুমুর, কবিগান ইত্যাদি গান কি শোনা যেতো শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ?

হাঁ, দুর্গাপূজোর গান, জন্মাষ্টমীর গান, হোলির গান, ঝুমুর, কবিগান, তরজা ইত্যাদি লোকসংগীত গেয়েছেন তিনি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, যাদুবিদ্যা-ভিত্তিক গান (ভাজো, লোলো, মাদার, ভাদু, জাওয়া, কাঠি নাচ, ঝাঁপান ইত্যাদি) তিনি গাইতেন না। লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরণের লোকসংস্কারের কথা তাঁর মধ্যে পেলেও যাদুবিদ্যা বা তুকতাক বিষয়ক কথা-ছড়া-বিশ্বাস তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গানের বেলাতেও দেখি একই জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, লোকজীবন গঠিত সমাজের সবাইকে নিয়েই। তাই তিনি একদিকে যেমন লোকচেতনার ঐতিহ্যকে হারিয়ে যেতে দিলেন না, অন্যদিকে উন্নত সাংস্কৃতিক ধারাকেও ‘ম্লেচ্ছ’ বলে বাতিল করলেন না। কথকতা-যাত্রা-মেলা-বাউল-কীর্তন যেমন তাঁর প্রিয়, তেমনি প্রিয় আধুনিক মনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। আর সেজন্যেই তিনি লোকমানসের নামে যাদুবিদ্যা বা তুকতাক জাতীয় কোনকিছুকে স্বীকার করতেন না। যেখানে জীবনের [illegible] বদলে অন্ধ বিশ্বাস, সেখানে তিনি অসহযোগী। মানুষ যেখানে প্রাণ খুলে জীবনের আনন্দকে প্রকাশ করেছে সেখানেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের সাথেই গেয়েছেন—“কালো বেড়াল কে পুষেছে পাড়াতে/ [illegible] দে গো গলিতে।” শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে ভদ্রবাবুদের মতো

তিনি চুলচেরা বিচারে মগ্ন হতেন না। আবার ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের (চিরঞ্জীব শর্মা) ব্রাহ্মসংগীতেও তাঁর আগ্রহ। বাবুসমাজে প্রচলিত টপ্পা তিনি পছন্দ করতেন, তবে নিধুবাবুর টপ্পা নয়, কমলাকান্তের টপ্পাপ্রধান গানই তাঁর প্রিয়। লোক-সংগীতের নামে চীৎকার ও অসংযত আবেগ তিনি পছন্দ করতেন না, আবার কেশব সেনের সমাজের ব্রাহ্মসংগীতে তিনি লোকমানসের ছোঁয়া আনতে বলতেন। "কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা, বলনা তাই"—বাঙালী লোকমানসের যে মূর্ছনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা'—সেই চিরন্তন লোকমানসকে তিনি গানের মধ্যে নিরাকার ব্রহ্মসংগীতকেও সরস করতে চেয়েছেন। শহরের মানুষকে তিনি সচেতন করেছিলেন গ্রামীণ জীবনের অকৃত্রিম প্রাণপ্রবাহ সম্পর্কে, পল্লীর মানুষকে সচেতন করেছিলেন উন্নত রাগ-রাগিনী সম্পর্কে। ভাবের সরল স্বাধীনতার সাথে মিলন ঘটিয়েছিলেন নতুন চেতনার।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নারী মানসে নতুন দিগন্ত —মা সারদা

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন এ-কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষী ও ঐতিহাসিক স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু সেই সাথে প্রশ্ন ওঠে, এঁদের পাশে সারদামণি দেবীর কী ভূমিকা? তিনি কি শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিনী এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্ঘ-জননী, অথবা নবযুগের সূচনায় একটি বিশেষ অধ্যায়! তাঁর জীবনের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা বিশেষ হয়নি। মা-সারদা প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "নারীত্ব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা—শ্রীশ্রীমা", স্বামীজী বলেছিলেন, "মা-কে কেন্দ্র করেই ভারতীয় নারীরা আবার জাগবে", আর এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব উক্তি: "ও কি যে-সে? ও আমার শক্তি। ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" ঐতিহাসিক বিচারে এ সব উক্তির তাৎপর্য নির্ণয় এখনও হয়নি। অথচ এ কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে বোঝা যাবে না, রামকৃষ্ণ-আন্দোলন লোকজীবনের কতটা কাছাকাছি যেতে পেরেছিল।

মা সারদা'র ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না হবার মূলে দুটি কারণ। প্রথমত, তিনি বই লেখেননি, বক্তৃতা দেননি। দ্বিতীয়ত, তাঁর সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়েছে তার বেশির ভাগই তাঁর কল্যাণময়ী মাতৃরূপ নিয়ে। তাঁর জীবনকলার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা বিশেষ হয়নি।

গত শতাব্দীতে ভারতে যে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, তার লক্ষণ ছিল বুদ্ধিবৃত্তির নবজাগরণ। মননবৃত্তির অনুশীলনে ব্যক্তিমানুষের উদ্বোধন ঘটিয়ে সমাজকে সৃজনশীল করাই ছিল সে-যুগের বৈশিষ্ট্য। অধমর্ণবাদী ডিরোজিয়ান্‌স্, পুনরুজ্জীবনবাদী শশধর তর্কচূড়ামণি, সমন্বয়বাদী রাজা রামমোহন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ—সকলেই জোর দিয়েছিলেন বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণের ওপর। দেশজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন থেকে পাশ্চাত্যের সদ্-ভাবাত্মক দিকগুলি আত্মীকরণের মধ্যেই সমন্বয়বাদীরা সমাজমুক্তির দিশা

পেয়েছিলেন। আমরা এই আলোচনায় সে-যুগের বিভিন্ন মনীষী ও সমাজ-নেতার পাশাপাশি মা-সারদার জীবনের ঘটনাবলী ও উক্তির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখব তিনি সমাজকে কি দিয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী একই আন্দোলনকে পুষ্ট করেছেন, একই ভাবধারায় তাঁদের জীবন ও বাণী উৎসর্গীকৃত হলেও এঁদের প্রত্যেকেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে ভাবধারার সাহায্যে তাঁরা নতুন এক আন্দোলনকে উপস্থাপিত করেছেন, সেই ভাবধারার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে এঁরা তুলে ধরেছেন স্বকীয় সুন্দর ভঙ্গিমায়। এই আলোচনায় আমরা প্রথমে দেখব, মা-সারদার যুক্তিনিষ্ঠা কিভাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুলিকে রূপদান করেছিল, এবং পরে দেখব এই যুক্তিনিষ্ঠার ফলে তিনি কিভাবে অসাধারণ সমাজ-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মননশীলতা

স্কুলের সার্টিফিকেট বা কলেজের ডিগ্রী তাঁর না থাকলেও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তাঁর জীবনে সবসময়েই দেখা গেছে। বালিকা অবস্থায় তিনি পড়াশুনো শুরু করলে ভাগ্নে হৃদয় তাতে বাধা দেয়। আত্মীয়া লক্ষ্মী পাঠশালা থেকে পড়ে এসে তাঁকে বাড়িতে পড়াতেন, দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় ভব মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে প্রতিদিন এসে তাঁকে পড়াতেন এবং পড়া নিতেন। পরিণত বয়সে মা-সারদা তাঁর ভাইঝি মাকু ও রাধুকে নিজেই পড়াতেন, গৌরীমা'র আশ্রমের ছাত্রীদের পড়াশুনোতেও তিনি খুবই উৎসাহ দিতেন। নিজের অল্প-শিক্ষিত শিষ্য-শিষ্যাদেরও তিনি সবসময় পড়াশুনোতে উৎসাহ দিতেন। কেবল পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, সমাজে ও বিশ্বে কোথায় কি চলছে সে-সম্বন্ধেও তিনি কৌতূহলী ছিলেন, শিষ্য-শিষ্যাদেরও এ-বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, "যেখানে যাবে, সব দিকে নজর রেখে চলবে কোথায় কি হচ্ছে। চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য, এরই সাথে মিলিত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা তাঁকে সাহায্য করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই শিক্ষাগ্রহণেও ছিল তাঁর স্বকীয়তা। অসাধারণ পতিনিষ্ঠা যেখানে অন্যান্য নারীকে স্বীয় স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করায় সেখানে মা-সারদা কিন্তু তাঁর মৌলিকত্ব দেখিয়ে-ছিলেন। সতী সাধ্বী নারীর মতো তিনি পতিকে অনুসরণ করেও স্বীয় স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দেননি, বরং যেখানেই বুঝেছেন নিজস্ব মতামত দৃঢ়ভাবে

প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্যদের বেশি করে খেতে দেওয়া, প্রথমজীবনে চরিত্র ভাল ছিলনা এমন একজন মহিলার হাত দিয়ে খাবার পাঠানো, মুক্তহস্তে ফল বিলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি বেশ কিছু ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতের বিরুদ্ধে নিজস্ব-মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। আবার পরবর্তী জীবনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সন্ন্যাস নেবার জন্য মা-সারদার কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তাতে সম্মতি দেননি, যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত মনে করে তাঁর জন্য গেরুয়া কাপড় আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন। এতেই বোঝা যায়, মা-সারদা প্রথম থেকেই স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত এবং যখন যেটি ঠিক বুঝেছেন সেটিই দৃঢ়ভাবে করে গেছেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি যেদিন প্রথম এসেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন "তুমি কি আমাকে সংসারে টেনে নিতে এসেছ?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "না, তোমার সাধনপথে সাহায্য করতে এসেছি।" ১৮ বছর বয়সের তরুণী বধূর এই সাহসী উক্তিই দেখিয়ে দেয় তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ। মা-সারদা তাঁর পতিনিষ্ঠা বজায় রেখেছেন স্বীয় স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেই। তাঁর এই স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ পরবর্তী জীবনেও দেখা যায়। প্লেগের সেবাকাজে বেলুড়মঠের জমি বিক্রি করে দেবার জন্য স্বামীজীর ইচ্ছে এবং মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে পুজোর ব্যবস্থা না রাখার ব্যাপারে মা-সারদা কিভাবে যুক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান করেছিলেন তা তাঁর জীবনী-পাঠক মাত্রেরই জানা ঘটনা। প্রথম ব্যাপারে তিনি স্বামীজীর মতকে খণ্ডন করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনায় তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। বেলুড়মঠে দুর্গাপূজোয় পাঁঠা বলি দেবার জন্য স্বামীজী ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা-সারদা তাতে আপত্তি জানান, আবার সমাজসেবার কাজকে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন গৃহীভক্ত স্বামীজীকে সমর্থন না করলেও মা-সারদা এ-ব্যাপারে স্বামীজীকে পূর্ণ সমর্থন জানান। স্বামীজী ও তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইয়েরা মা-সারদাকে কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জন্যই শ্রদ্ধা করতেন না, তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর তাঁদের গভীর আস্থা ছিল বলেই তাঁরা তাঁকে সঙ্ঘজননী বলে মান্য করতেন।

তুচ্ছ আচারের বিরোধিতা

এই মননশীলতা ও যুক্তিনিষ্ঠার ফলেই মা-সারদা বহু তুচ্ছ আচারকে উপেক্ষা

করে যথার্থ সত্যের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন। দেশাচার যে তিনি মানতেন না তা নয়, তবে যে অনর্থক দেশাচার পদে-পদে মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, মানুষকে পিষে মারে, তাকে তিনি সমর্থন জানান নি। তৎকালীন যুগে বিধবা নারীদের ক্ষেত্রে সমাজপতিরা যেসব কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন সে-সম্বন্ধে মা-সারদা মন্তব্য করেছিলেন, "ঐসব খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে সেটাই করবে।" বিধবা মহিলাদের তিনি খাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা করতে মানা করতেন। তাঁর দুই বিধবা শিষ্যাকে তিনি বলেছিলেন, "চুল ছোট করে কেটেছো কেন? চুল বড় রাখবে, তেল মেখে স্নান করবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরও তিনি লাল পাড়দেওয়া শাড়ি পরতেন, হাতে চুড়ি রাখতেন। এ-প্রসঙ্গে ভক্তেরা একটা ঘটনা জানেন, দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দিয়ে বৈধব্য-বেশ ধারণ করতে মানা করেন। কিন্তু যারা অলৌকিক দর্শনে বিশ্বাসী নন, যারা নাস্তিক, তারা একবার ভেবে দেখুন যে মা-সারদা এ-ব্যাপারে কতখানি সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। জয়রামবাটির মতো রক্ষণশীল গ্রামেও তিনি নিজে মাংস রান্না করে ভক্তদের খাইয়েছেন। অনর্থক শুচিবাইয়ের ওপরও তাঁর একটা স্বাভাবিক বিরাগ ছিল। এ-বিষয়ে তাঁর মন্তব্য—"বড় পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয়? শুচিবাই! মন কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না! শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে।"

তৎকালীন যুগে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে পণ্ডিতদের বিশেষ বিরাগ ছিল এবং কেউ বিদেশ থেকে ফিরে এলে তাকে সমাজচ্যুত করা হত। এই সামাজিক প্রথাকে আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করার জন্য কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী আলেকজাণ্ডার মিলারকে অনুরোধ করলে মন্ত্রী বলেন, সমাজসংস্কারের তাগিদ সমাজের ভেতর থেকেই আসা উচিত এবং ঐ ব্যাপারে ব্রাহ্মণদেরও সমর্থন থাকা চাই। মা-সারদা কিন্তু এই দেশাচারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই স্বামীজীকে সমুদ্রযাত্রায় অনুমতি দেন। যেখানে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত প্রগতিশীল মানুষও বলেছিলেন যে সন্ন্যাসী হয়ে স্বামীজীর উচিত হয়নি ম্লেচ্ছদেশে যাওয়া (শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩, এবং ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫৪-৫); রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আরো বলেছিলেন যে কায়স্থ বলে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হতে পারেন না.
যেখানে এঁদের মতো মানুষ দেশাচারের ওপরে উঠতে পারেননি, সেখানে
মা-সারদার মতো একজন অল্পশিক্ষিতা বিধবা মহিলা অনায়াসেই এই তুচ্ছ
আচারকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন।

বালগঙ্গাধর তিলক এবং মাধবগোবিন্দ রানাডে (প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক)
১৮৯০ সালে ইংরেজদের আয়োজিত চা-পান সভায় আমন্ত্রিত হয়ে তাদের
সাথে বসে খেয়েছিলেন। ম্লেচ্ছদের সাথে খেয়েছেন এই 'দোষে' সমাজপতিরা
তাদের পতিত বলে ঘোষণা করলে তাঁরা দুজনেই প্রায়শ্চিত্ত করে সে 'দোষ'
কাটালেন। (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)।
বিপরীতদিকে মা-সারদা বহুবার ভগিনী নিবেদিতা, মিসেস ওলি বুল, মিস
জোসেফাইন ম্যাকলাউড প্রমুখ বিদেশিনীদের সাথে একসঙ্গে বসে খেয়ে-
ছিলেন, কিন্তু এর জন্য তিনি কখনও প্রায়শ্চিত্ত করতে যাননি।

সংস্কারমুক্ত মানসিকতা

গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত মানুষ সমাজে হঠাৎ সৃষ্ট এমন পরিস্থিতির সমাধান
চায় তা এড়িয়ে গিয়ে। মা-সারদা এসব ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারমুক্ত চারিত্রিক
মাধুর্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে নতুন পথের হদিশ দিয়েছেন সমাজের
তথাকথিত চরিত্রহীনদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ও মন্তব্যে। কলকাতায় তাঁর
বাড়ির সামনের বস্তিতে একটি লোক তার উপপত্নীর কঠোর অসুখ হলে প্রাণ
দিয়ে তার সেবা করে। এই দেখে মা-সারদা মন্তব্য করেছিলেন, "কি
সেবাটাই করেছে মা, এমন দেখিনি! একেই বলে সেবা, একেই বলে টান।"
কোয়ালপাড়া গ্রামে এক ডোমের মেয়ে একদিন মা-সারদার কাছে এসে
অভিযোগ করে যে সে তার উপপতির জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছিল, কিন্তু
এখন সেই উপপতিটি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। মা-সারদা তখন সেই
লোকটিকে ডাকিয়ে এনে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "ও তোমার জন্য সর্বস্ব
ত্যাগ করে এসেছে; এতকাল তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন যদি ওকে
ত্যাগ করো, তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান হবে না।" এইভাবে তিনি
উভয়ের মধ্যে আবার মিলন ঘটিয়ে দেন। সমাজের পতিত অবহেলিতদের
ওপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে দরদ দেখিয়ে গিয়েছেন, তার অনেক
আগেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এ-ধরণের মানসিকতা দেখি যখন তিনি

নাটক বা যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রী, মাতাল, লম্পটদেরও ভালবাসা দিয়ে নিজের কাছে আকর্ষণ করেছিলেন। মা-সারদার মধ্যে আমরা সেই মনোভাবই উজ্জ্বলরূপে দেখতে পাই।

জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা

যুক্তিনিষ্ঠা ও সংস্কারমুক্ত মনের ফলে মা-সারদা জাতিভেদ-প্রথার বিরোধী ছিলেন। এজন্য গ্রামবাসীদের অনেকেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। "মাগো, বামুন হয়ে ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়োচ্ছ?" "শূদ্রের হাতে খাচ্ছো?" "তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এদের রান্না কেন খাবে?"—এই ধরণের অভিযোগ তাঁকে প্রায়ই শুনতে হত। তিনি নিজে অব্রাহ্মণদের এঁটো পাতা পরিষ্কার করতে কোনরকম সঙ্কোচ বোধ করতেনই না, এমন-কি বৈশ্য, শূদ্র, বারুজীবী বংশীয় লোকের রান্না খেতেও দ্বিধাবোধ করেননি। জাতিভেদপ্রথার ওপর তাঁর এই বিরূপতার জন্য জয়রামবাটির জমিদার ও সমাজপতিরা তাঁকে বহুবার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, কিন্তু মা-সারদাকে তাঁব পথ থেকে টলানো যাযনি। সে-সময়ে রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালযে কিন্তু জাতিভেদ-প্রথা মানা হত। সেখানে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণেরা পৃথক পংক্তিতে বসে খেতেন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, বিশ্বভারতী, ১৩৬৮, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭)। এমন-কি ব্রাহ্মণ-ছাত্র, ব্রাহ্মণ-শিক্ষককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেও অব্রাহ্মণ-শিক্ষককে হাতজোড করে নমস্কার করত। এই প্রসঙ্গে রবিঠাকুরকে অভিযোগ জানালে তিনি একটি চিঠি লিখে তার উত্তর দেন—"প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালযে স্থান দেওয়া চলিবে না। সংহিতায যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্রেরা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে, এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।" (ঐ' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭) সে-সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলিতে কিন্তু ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণেরা একসাথে বসেই খেত। প্রণাম করার বিষয়ে রবিঠাকুরের মত কি তা আমরা দেখলাম। এবারে মা-সারদার কথা। একদিন একজন ডাক্তারবাবু মা-সারদার ভাইঝি অসুস্থ রাধুকে দেখতে আসেন। মা-সারদা তখন রাধুকে বলেন, "রাধু, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর্।" ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর সেখানে উপস্থিত এক মহিলা আতঙ্কিত হয়ে

বলে ওঠেন, "মা, এ কি করলে! রাধু বামুনের মেয়ে আর ডাক্তার শূদ্র। তুমি রাধুকে বললে ডাক্তারকে প্রণাম করতে!" মা-সারদা উত্তর দেন—"সে কি, প্রণাম করবে না! ডাক্তার কতবড় জ্ঞানী।" লক্ষ্যণীয় বিষয়, রবিঠাকুরের মতো মনীষী যেখানে প্রণামের ব্যাপারে হিন্দুপ্রথার ও শাস্ত্রের দোহাই দিতেন, সেখানে মা সারদা সহজেই এই আচারকে তুচ্ছ বলে নির্দেশ করেছেন। এতেই বোঝা যায় তাঁর কাছে মানুষের জন্ম বা বর্ণ নয়, মানুষের চরিত্র ও জ্ঞানই ছিল বড়।

বিশুদ্ধ ধর্মের জাগরণ

মা সারদার সমগ্র জীবনই আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ এবং এই ভাবকেই তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে গেছেন। এ-সত্ত্বেও কিন্তু ধর্মের নামে অলৌকিকতা ও অন্ধ গুরুবাদের প্রশ্রয় তিনি কখনও দেননি। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে যখন তাঁর দেবীসত্তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে কিংবা তিনি নিজে তাঁর দৈবী স্বরূপের কথা বলে ফেলেছেন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই তিনি তা চাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়! তাঁর এক শিষ্য—কলেজের ছাত্র—কলকাতায় এক মেসে থেকে পড়াশুনো করত। একদিন সকালবেলা সে নিজের ঘরে জানালার পাশে বসে পড়ার সময় একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো। সে দেখলো, একটি লাল জ্যোতি আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ছাত্রটি লক্ষ্য করলো, ঐ জ্যোতিটি বাগবাজারের দিক থেকে উঠে কালীঘাটের দিকে চলে গেল। দেখে তাঁর ধারণা হলো যে এটি একটি অলৌকিক দৃশ্য এবং মা-সারদা নিশ্চয়ই সেদিন উদ্বোধন (বাগবাজারে তাঁর বাড়ি) থেকে কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছেন। এই ধারণা ঠিক কিনা তা জানার জন্য ছেলেটি কিছুদিন পর উদ্বোধনে গেল এবং জানল যে মা সারদা সেদিন সত্যিই কালীঘাটে গিয়েছিলেন। ছেলেটি বাড়ির দো-তলায় (যেখানে মা-সারদা থাকতেন) উঠে আসতেই মা-সারদা তাঁকে হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞেস করে প্রসাদ খেতে দিলেন। প্রসাদ খেতে খেতে ছেলেটি যখন লাল জ্যোতি-দর্শনের কথা বলল, মা-সারদা তখন গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, ওসব খবরে কাজ কি? আর না-হয় সত্যিই দেখেছো, কিন্তু তাতে কি হবে?" এই উক্তিই প্রমাণ করে তাঁর চরিত্রের এক মহান বৈশিষ্ট্য। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষ চেতনার

জাগরণের চেয়ে অলৌকিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। তিনি তাই এই অলৌকিকতার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মের তাৎপর্য ছিল—মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশ এবং দৈনন্দিন জীবনে ঐ দেবত্বের প্রয়োগ। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনি ধর্মের নামে অলৌকিকতা, ম্যাজিক, তুক্‌তাক্ ইত্যাদিকে নিন্দা করে গেছেন, রোমান্টিক ধর্মের বদলে বিশুদ্ধ ধর্মের জাগরণে মানুষের চিত্তশুদ্ধির ওপরই জোর দিয়ে গেছেন।

অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি সাধন-ভজন ও মনের পবিত্রতার ওপর জোর দিতেন। কেউ যদি জপ-ধ্যান করতে পারবে না বলত তবে মা-সারদা তাকে স্পষ্টই শুনিয়ে দিতেন, "সে কি! ইষ্টমন্ত্র জপ করবে না? তাহলে তোমারই যাবে, আমার কি হবে?" সেই সাথে গৃহীদের তিনি বার-বার বলতেন দানের কথা। শুধু গরীবদের প্রতি সমবেদনা জানালেই হবে না, তাদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু করা চাই—এই মত পোষণ করতেন তিনি। মানুষকে তিনি সবসময়ই আবেগ-সর্বস্বতাকে পরিহার করতে শিখিয়েছেন। হৃদয়বৃত্তির আধিক্য অনেক সময়ই শ্রেয়র চিন্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভাবাবেগের মত্ততা যুক্তিবোধকে নষ্ট করে। আবেগ প্রবল হয়ে উঠে মানুষের শক্তি ও উদ্যমকে নষ্ট না করে ফেলে, সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি। একজন ব্রহ্মচারীর হাত থেকে একটি গ্লাস পড়ে ভেঙ্গে গেলে তিনি বলেন, "বাবা, গাছতলার সাধু চাই না।" অর্থাৎ তিনি চাইতেন সাধু-সন্ন্যাসীরা কেবল জপ-ধ্যানেই দক্ষ হবেনা, সেই সাথে কর্মকুশলীও হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা সাধন-ভজন, পড়াশোনা, এবং কর্মকুশলতায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ যাতে হয়ে উঠতে পারে সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ন নজর। এবং পড়াশোনা বলতে কেবল শাস্ত্রগ্রন্থই নয়, জাগতিক বিদ্যার চর্চাও তিনি চাইতেন। গৌরীমা'র সারদেশ্বরী আশ্রমের ছাত্রী দুর্গা (পরে সন্ন্যাসিনী হয়ে দুর্গাপুরী বা দুর্গামা নামে পরিচিতা) সংস্কৃত ও বাংলা শেখার সাথে সাথে ইংরেজী পড়তে চাইলে কয়েকজন সনাতনপন্থী তাতে আপত্তি জানান। মা-সারদা তখন গৌরীমাকে ডেকে বলেন, "আমার মেয়ে (অর্থাৎ-দুর্গা) কিন্তু ইংরেজী পড়বে।"

ধর্মের সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ মনোভাব দেখাবার সাথে সাথে মা-সারদা অন্ধ গুরুবাদের প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি বলতেন, উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয়না।" মার্কিন মহিলা ওলি বুল্ যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন, "গুরুর প্রতি কি-ধরণের আজ্ঞাবহতা থাকা উচিত?" তিনি উত্তর দেন,

"তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশ মানবে, কিন্তু জাগতিক বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে, এমন-কি যদি তা গুরুর উপদেশের বিরোধী হয় তাহলেও।" যারা সাধারণ লোকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে গুরুগিরি করে, তিনি তাদের 'ব্যবসাদার সাধু' বলতে সঙ্কোচ করেননি। ধর্মের নামে কেউ সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। দুইজন গৈরিকধারিনীকে তিনি সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন, "তোমাদের গুরু যদি সর্বজ্ঞ হতেন, তাহলে ঐ কথা বলতেন না।"

নারীমুক্তির স্বরূপ

তৎকালীন যুগে নারীদের মধ্যে কিছুটা রূপান্তরের ছাপ লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই রূপান্তরের প্রকৃত চিত্রটি কি ছিল? কেউ ইংরেজী কবিতা লিখতেন, কেউ বা ঘোড়ায় করে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতায় এ সবই গৌণ। মানসিক রূপান্তর না ঘটলে, স্বাধীন চিন্তা ও কর্মে প্রবৃত্ত না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা তো আসতে পারে না। তৎকালীন মনীষীরা ও সমাজনেতারা যে নারীমুক্তির চিন্তা করতেন তা ছিল সীমিত—নারী যেখানে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে যে শৈবলিনী একদিন গঙ্গার বুকে প্রতাপকে স্পর্শ করে শপথ নিয়েছিল "আজি হইতে তোমাকে ভুলিব", সেই শৈবলিনী দীর্ঘ কৃচ্ছ্র সাধনার পর উপন্যাসের শেষে প্রতাপের কাছেই আশ্রয় চেয়েছে। বিদ্যায় তেজে শক্তিতে মহিয়সী দেবী চৌধুরাণীও একই পথের পথিক। মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে তেজস্বিনী প্রমীলা বীরদর্পে বলে উঠেছে "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?" কিন্তু এই বীরত্বের উৎস "রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী।" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও মহীয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু তারা বারবার হারিয়ে যান কেন? পল্লীসমাজের রমা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ঠিকই, কিন্তু উপন্যাসের শেষে রমা কাশীতে চলে যায় সংগ্রাম অসমাপ্ত রেখেই। রবিঠাকুর অবশ্য স্বাধীন নারীর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবজীবনে কি তিনি সেই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন? তাঁর তিন মেয়ের বিয়েই তিনি অল্পবয়সে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ এতকাল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গদ্যে পদ্যে বহু রচনা লিখিয়া অবশেষে স্বয়ং সেই জিনিসটা সমর্থন

করিলেন কি করিয়া—বাণী ও জীবনের মধ্যে এ অসংগতি কেন, তাহার সদুত্তর নাই।" (রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০) মৈত্রেয়ী দেবী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা প্রসঙ্গে রবিঠাকুরের সাথে তাঁর আলোচনার কিছুটা লিপিবদ্ধ করে মন্তব্য করেছেন—"আমাদেরও বিশ্বাস কোন নারীই সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না।" (রবীন্দ্রনাথ: গৃহে ও বিশ্বে—কলকাতা ১৩৮৩, পৃঃ ৯২)

(মা-সারদা কিন্তু নারীকে দেখতে চেয়েছিলেন প্রকৃত স্বাধীন সত্তার অধিকারিণী হিসেবে, যে-নারী তার নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করতে পারবে কোনও পুরুষের সাহায্য না নিয়ে। গৌরীমা যখন আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন নারীশিক্ষার জন্য, মা-সারদা তাঁকে বলেছিলেন, "গৌরী, তুমি মেয়েদের বুঝিয়ে দাও যে তারা কেবল থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় করতে জন্মগ্রহণ করেনি, ইচ্ছে করলে তারাও অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে।" নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত সহজ কথায় তিনি কি গভীর তাৎপর্য তুলে ধরেছিলেন। নিবেদিতার স্কুলের সুধীরা দেবী প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষিকাকে স্বাধীনভাবে সমাজসেবায় ব্রতী দেখে মা-সারদা খুবই আনন্দ প্রকাশ করতেন। এক স্ত্রী ভক্ত তার অবিবাহিত মেয়েদের বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দাও—লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" তাঁর আরেকটি উক্তি—"মাদ্রাজের দুটি মেয়ে, বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই। নিবেদিতার স্কুলে আছে। আহা, তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে আট বছর হতে না হতেই বলে: পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।" রাধুর বিয়ের আগে জনৈক ভক্ত মা-সারদাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন মাস্টারমশাইকে (কথামৃতকার) উপযুক্ত পাত্রের জন্য বলতে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি কাউকে বন্ধনে ফেলার জন্য বলতে পারবো না।" এইসব ঘটনা ও উক্তি থেকে বোঝা যায়, তিনি নারীমুক্তি সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন। বিয়ে করে সংসারে প্রবেশ করাকে তিনি ছোট করেননি, কিন্তু তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন যখন দেখতেন মেয়েরা বিয়েকেই চরম লক্ষ্য না করে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।)

মা'র নিজের জীবন ছিল এরই উদাহরণ। রামকৃষ্ণ মিশন ও সারদেশ্বরী

আশ্রমের মতো ছুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্ঘজননী ছিলেন তিনি। এ-ধরণের ছুটি বৃহৎ সংগঠন পরিচালনার উদাহরণ আমরা তৎকালীন যুগে অন্য কারোর মধ্যে তো দেখিই না, ইতিহাসেও এমন উদাহরণ খুব কম। মা সারদা সেইসাথেই নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে সারদেশ্বরী আশ্রমের সব কাজ পরিচালনা করবেন সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিনীরা, প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিচালকের পদেও থাকতেন এঁদেরই একজন, রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসী এঁদের কোন নির্দেশ দিতে পারবেন না। মা সারদার এই নির্দেশ অনুসারীই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন। প্রশ্ন হতে পারে, বৌদ্ধসঙ্ঘে এবং খৃষ্টান রোমান ক্যাথলিক চার্চেও সন্ন্যাসিনীরা আছেন এবং তারাই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন, অতএব মা-সারদার বৈশিষ্ট্য কোথায়? বৈশিষ্টা এখানেই যে বুদ্ধদেব কিংবা ক্যাথলিক পোপ কেউ-ই নারীকে সর্বোচ্চ পদে বসতে দেননি। নারীদের সন্ন্যাসে অধিকার বুদ্ধদেব দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সাথেই নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলেন যে ভিক্ষুনীরা সবসময় ভিক্ষুর নির্দেশে কাজ করবেন এবং সঙ্ঘের সর্বোচ্চ পদে ভিক্ষুনীরা বসতে পারবেন না। একই নিয়ম ক্যাথলিক চার্চেও। পোপের আসনে পুরুষদেরই একমাত্র অধিকার, নানেরা (Nun) শুধু যে পোপ হতে পারেন না তা নয়, আর্চবিশপ বিশপ এমন-কি প্রীস্টও হতে পারেন না। গত আড়াই হাজার বছরে বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসে মা-সারদাই প্রথম নারীকে এই দুর্লভ সম্মান দিয়ে গেলেন। তিনি তাই ইতিহাসের এক অনন্য চরিত্র। নারী যে নিজ শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে পারে, সমাজে এক ক্রিয়াশীল ভূমিকা নিতে পারে পুরুষের সাহায্য ছাড়াই— তিনি তা দেখিয়ে দিলেন নিজের জীবনে, বাস্তব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, এবং সারদেশ্বরী আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদের দিয়ে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধ

দেশের স্বাধীনতার জন্য মা-সারদার আগ্রহ ছিল খুবই। তাঁর জীবনী-গ্রন্থে দেখা যায়, বৃটিশ রাজত্বের অবসানের জন্য তিনি সকলের কাছে খোলাখুলি-ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁর বেশ কয়েকজন গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য পুলিশের নজরবন্দী ছিলেন। অনেক স্বদেশী বীরাঙ্গনাকে বৃটিশের পুলিশ অন্যায়ভাবে ধরে নিয়ে যায় থানায়—এই খবর তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি উত্তেজিতভাবে সকলের সামনেই বলেন, "এমন

কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে পুলিশকে দুই চড় মেরে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?" পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করানো স্বাধীন ভারতেই অপরাধ বলে গণ্য করা হয়; আর বৃটিশ-ভারতে তো একটি গুরুতর ক্রাইম্ হিসেবেই মনে করা হতো। মা-সারদা কিন্তু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, পুলিশ যদি অন্যায় করে তবে পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দরকার, এমন-কি শুধু অহিংস পন্থায় নয়, হিংসাত্মক পথের আশ্রয়ও নেওয়া যেতে পারে পুলিশের বিরুদ্ধে। দেশের স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতি এবং পুলিশের বিরুদ্ধে মন্তব্য—স্বভাবতই বৃটিশ পুলিশের সন্দেহ তাঁর ওপর ঘনীভূত হয়। জয়রামবাটিতে মা-সারদার কাছে যারা আসতেন তাদের সবার নাম থানা থেকে পুলিশ এসে লিখে নিয়ে যেত। সন্দেহ আরও বাড়লে সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁর বাড়ির আশেপাশে সবসময় থাকতে শুরু করে। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "আহা কি-সব চাঁদের মতো ছেলে, দেশের জন্য কতই না দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করছে।" তাঁর এ-ধরণের কথাবার্তায় পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। ফলে একজন গোয়েন্দা অফিসার ভক্তের ছদ্মবেশে রোজই তাঁর কাছে আসতে থাকেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেও মা-সারদা সব সময়ই লক্ষ্য রাখতেন, বিপ্লবীদের সংগ্রাম যেন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় না দেয়। বৃটিশদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "তারাও আমার ছেলে।" তিনি কতদূর সমাজ-সচেতন ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সংকীর্ণ জাতীয়তা-বাদের বদলে তিনি জোর দিচ্ছেন উদার জাতীয়তাবাদের ওপর। এই উদার জাতীয়তাবাদই মানুষকে ক্রমশ আন্তর্জাতিক করে তোলে। তাঁর বিপ্লবী শিষ্য-শিষ্যাদের তিনি বলতেন, "শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু, সবের মূল ঠাকুর [শ্রীরামকৃষ্ণ]—তিনিই আদর্শ। যা কিছু করনা কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।" এই কথার দুটি তাৎপর্য। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব ছিল ত্যাগ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে থাকার অর্থ ত্যাগকে ধরে থাকা। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ও স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ক্ষেত্রে-আমরা দেখেছি যে ত্যাগের অভাবে অনেকেরই সৎ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে থাকলে বিশ্বের সকল নর-নারীর সাথেই আত্মীয়তা-বোধ হবে, যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী ও ভক্তেরা শুধু ভারতেরই নয়, এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

ফলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বদলে বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হবে উদার আন্ত-র্জাতিকতা-বোধে। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ কিভাবে প্রথমে অন্যের ক্ষতি ও পরে নিজের ক্ষতি ডেকে আনে। মা-সারদা সেজন্য দেশের স্বাধীনতা কামনা করলেও লক্ষ্য রাখতেন, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত যেন বিশ্বমৈত্রীতে পরিণতিলাভ করে।

বিস্ময়কর সমাজচেতনা

ভারতের নবজাগরণকে অনেকেই বৃটিশ-শাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন ; ইতিহাসের অবচেতন হাতিয়ার হিসেবে ইংরেজদের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছেন। নবজাগরণের অন্যান্য নায়কদের দিকে তাকালে আমরা এর তাৎপর্য বুঝতে পারি। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, বৃটিশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পাশ্চাত্যে রেনেসাঁ, মিল-হেগেলের চিন্তাধারা, এবং সেইসাথে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উপলব্ধিতেই এঁরা নবজাগরণে আগ্রহী হয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবিঠাকুর পর্যন্ত অগণিত নায়কদের পেছনে এ-সবের অবদান কম নয়। কিন্তু মা-সারদার ক্ষেত্রে বিষয়টি সে-রকম ছিল না। মিল-বেন্থাম-হেগেলের চিন্তাধারা কিংবা আমেরিকা-বৃটেন-ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রভাব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—এ-কথা কেউ বলবে না। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, উপরোক্ত সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রভাবে প্রভাবিত না হয়েও তিনি স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। আসলে, তিনি খোলা চোখে মানুষকে লক্ষ্য করেছিলেন, খোলা মন নিয়ে সমাজকে উপলব্ধি করেছিলেন, সুস্থ মননশীলতায় অধিকারী হয়েছিলেন এক অননুকরণীয় ব্যক্তিত্বে, পরিচয় দিয়েছিলেন অপূর্ব সমাজচেতনার। এ-প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক।

১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাবার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন্ চৌদ্দ দফা শান্তিপ্রস্তাব ঘোষণা করেন। তাঁর এই শান্তিপ্রস্তাবকে বিশ্ববাসী তখন স্বাগত জানিয়েছিল এবং এই প্রস্তাবের জের টেনে প্রতিষ্ঠিত হয় লীগ অব্ নেশন্‌স্ বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রনেতারা যখন এই শান্তিপ্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তখন মা-সারদা

কী বললেন? তাঁর এক ভক্ত যখন সংবাদপত্র থেকে উইলসনের শান্তি-প্রস্তাবগুলি তাকে পড়ে শোনালেন, তিনি সব শুনে মন্তব্য করলেন, "ওরা যা বলে ওসব মুখস্থ। যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।" পরে নিজেই তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—"ওসব ওরা মুখেই বলে, অন্তর থেকে নয়।" মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর উক্তির সত্যতা।

একদিন এক ভক্ত কলকাতা থেকে জয়রামবাটিতে তাঁর কাছে গেলে মা সারদা তাকে জিজ্ঞেস করেন কি করে সে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছুলো। ভক্তটি ট্রেনের উল্লেখ করায় মা সারদা তখন বৃটিশের রেল-টেলিগ্রাফ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির খুব প্রশংসা করলেন। উৎসাহ পেয়ে ভক্তটি বৃটিশ-শাসনের নানান দিকের কথা তুলে এই শাসনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে। সব শুনে মা-সারদা মন্তব্য করলেন, "কিন্তু বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।" লক্ষ্যণীয় বিষয়, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনের কাছে সাম্রাজ্য-বাদের ভাল মন্দ দুটি দিকই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার উপনিবেশে স্বীয় স্বার্থেই রেলপথ টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যাপক করে। ফলে সাধারণভাবে উপনিবেশে নতুন আলোর ছোঁয়া লাগে। কিন্তু শোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য সেখানে স্থায়ীভাবে কোন লোককল্যাণ হতে পারে না, মানুষের খাওয়া-পরার কষ্ট দিন-দিনই বাড়ে। এই দুটি দিকই মা সারদার কাছে ধরা পড়েছিল।

দেশে একবার প্রচণ্ড বস্ত্রাভাব দেখা দিলে তিনি বলেছিলেন, "আগে ঘরে-ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কাপাস চাষ হত, সকলেই সুতো কাটত, নিজেদের কাপড় নিজেরাই করিয়ে নিত, কাপড়ের অভাব ছিল না। [ইস্ট ইণ্ডিয়া] কোম্পানী এসে সব নষ্ট করে দিল। কোম্পানী সুখ দেখিয়ে দিল—টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাও। সব বাবু হয়ে গেল—চরকা উঠে গেল। এখন বাবু সব কাবু হয়েছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মা সারদা যখন এই কথা বলেছিলেন তখন গান্ধীজীর চরকা ও অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়নি। মা-সারদা অর্থনীতির ছাত্রী ছিলেন না মার্কস লেনিনের বই পড়েননি, অ্যাডাম স্মিথের নামও শুনেছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু মননশীলতার সাহায্যে ঘটনা-পরম্পরার তাৎপর্য অতি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং সহজ ভাষায় সহজ ভাবে নিজস্ব বক্তব্য রেখে এক বিস্ময়কর সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উত্তরবাহকেরা তিনশ বছরের মধ্যেই চরিত্র পাল্টে ভারতে হাজির হয়েছিল। প্রাথমিক স্থিতি লাভ করে তারা প্রথমেই এ-দেশের কুটিরশিল্প ও কৃষি-কেন্দ্রিক স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (মা সারদার ভাষায় "ঘরে-ঘরে চরকা ছিল, ক্ষেতে কাপাস চাষ হতো") ভেঙে দিল ("সব নষ্ট করে দিল")। এর জন্য বৃটিশেরা যতখানি দায়ী, ভারতীয়রা তার চেয়ে কম নয়, বিশেষতঃ নবাশিক্ষিত বাবু-সম্প্রদায় ("সব বাবু হয়ে গেল")। এই সম্প্রদায় স্বীয় স্বার্থেই বৃটিশকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল এবং এভাবেই নষ্ট হয়ে গেল দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা। বৃটিশ যে পাশ্চাত্য রেনেসাঁর গঠনমূলক দিকটিকে বহন করে এনেছে, মা-সারদা তাকে স্বাগত জানালেন (আমরা আগেই দেখেছি, ইংরেজী শিক্ষাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন) কারণ তিনি উপলব্ধি করলেন যে এর ফলে ভারতীয়দের দীর্ঘকালের তমিস্রা অনেকটা দূর হবে। কিন্তু সেইসাথেই তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিলেন সাম্রাজ্যবাদের মন্দ দিকগুলির বিষয়ে।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র

আগের কথায় ফিরে যাই। যে নবজাগরণ ঘটে গিয়েছিল এদেশে, তার ইতিহাসে মা-সারদার স্থান কি ? যেসব একদেশী দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ রাজনীতিকেই সবকিছুর মানদণ্ড বলে ধরেন তাদের কাছে মা-সারদার জীবনের তাৎপর্য ধরা পড়বে না। আবার যারা রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-সুরেন্দ্রনাথের কথা ভাবেন তারা গভীরভাবে চিন্তা করুন—কোন্ পরিবেশ ও শিক্ষাজগৎ থেকে ঐ মনীষীদের আবিভাব হয়েছিল, এবং মা-সারদার আবির্ভাব কোন্ পরিবেশ থেকে ! সামাজিক পটভূমি বা সোস্থাল ব্যাকগ্রাউণ্ড বিপরীত মেরুর হলেও চারিত্রিক বিকাশে ও মননশীলতায় মা-সারদা এঁদের থেকে আদৌ পিছিয়ে ছিলেন কিনা তা বিচার্য। অজ পাড়াগাঁ'র একজন স্বল্পশিক্ষিতা বিধবা মহিলা হয়েও তিনি যেভাবে অনর্থক দেশাচার, যুক্তিহীন অমানবিক জাত-পাত, অন্ধবিশ্বাস, রোমান্টিক অলৌকিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, যেভাবে তিনি নারীদের প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করে তাঁদের সমাজে ক্রিয়াশীল করে তুলেছেন, তা তৎকালীন ভারতীয় সমাজে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। যুক্তিহীন দেশাচারের বিরুদ্ধে তিনি তো শুধু নিজেই ওঠেন নি, টেনে তুলতে চেয়েছেন তাঁর অগণিত শিষ্যশিষ্যাদেরও। নিজে গুরু হয়েও

অন্ধ গুরুবাদের বিরোধিতা করে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই মা এক অনুকরণীয় আদর্শের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন।

মা-সারদার মধ্যে আর কি দেখি? ধর্মের নামে অবিশ্বাস ও বিচারবিহীন আচার-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ধর্মের জাগরণের যে-প্রয়াস রামমোহনের মধ্যে ছিল, মা-সারদার মধ্যেও তার লক্ষণ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তফাৎটা হচ্ছে এই যে, রামমোহন পাশ্চাত্য ভাবধারায় সঠিক পথটি বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, আর মা সারদা এই কাজ করেছিলেন স্বীয় যুক্তিনিষ্ঠ মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। তাছাড়া রামমোহনের কাছে ধর্মটা ছিল অনুশাসন বিশেষ, code of conduct-এর ওপর মূল দৃষ্টি থাকায় তিনি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকটিতে তেমন নজর দেননি।

রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা বন্ধের মাধ্যমে নারীমুক্তির চিন্তা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর আরও এগিয়ে বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে মন দিলেন। কিন্তু নারী যে পুরুষের মতোই সমাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে নিজেকে স্বাধীনভাবে উপস্থাপিত করতে পারে—এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মধ্যে কোনও চিন্তা বা প্রয়াস দেখা যায় না। নারী মুক্তির মন্ত্র খুঁজতে বিদ্যাসাগর আশ্রয় করেছিলেন তাঁর মানবতাবোধকে শাস্ত্রের সাহায্যে। তাঁর এই মন্ত্র আরও বিকশিত হয়েছিল মা-সারদার বাণী ও কর্মে। দেশী-বিদেশী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি নজর দিতে হবে মননশীলতা ও আত্মশক্তিতে—মা সারদা এভাবেই নারী মুক্তির যথার্থ পথটি দেখিয়ে দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাম্যবাদ, শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ইত্যাদি সত্ত্বেও ভারতের মুক্তির পথে হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিলেন। তাছাড়া সমাজের মুক্তিকেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি বলে তিনি মনে করতেন। মা-সারদা এ প্রসঙ্গে উন্নততর পথের নির্দেশ দিয়েছেন। "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে"—এই উক্তির মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদ নয়, সকল ভারতীয়কে সম্মিলিত করে সমন্বয়বাদী আদর্শের মধ্যেই যথার্থ মুক্তিমন্ত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। সমাজের মুক্তিকে বড় করে দেখলেও তিনি দেখিয়ে দিলেন যে সমাজ যেহেতু ব্যক্তিরই সমষ্টি, অতএব ব্যক্তিমানুষের মুক্তি না ঘটলে সামাজিক মুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি তাই সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করার সাথে সাথে ব্যক্তিমানুষ গঠনের ওপর জোর দিতেন।

মা-সারদার মহিমময় চরিত্রে মননশীলতা ও ব্যক্তিমানুষের জন্ম মুক্তির কামনা কত গভীর তা আমরা দেখলাম। সাধারণ এক শাড়িতে বিভূষিতা তিনি অগ্নিশিখার মতোই বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন, পুড়িয়ে দিচ্ছেন অন্ধ আচারকে। কিন্তু তা বলে কেবল ভাঙনের জয়গান গাইতেই তো তিনি আসেননি, তিনি এসেছিলেন জীবনের জয়গান গেয়ে সমাজকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিতে। নির্বিচারে সবকিছুকে গ্রহণ করতে যেমন তিনি অরাজী ছিলেন, সবকিছুকে নির্বিচারে বর্জন করতেও ছিল তাঁর আপত্তি। যুগ-যুগান্তর ধরে যে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সেই অভিজ্ঞতাকে ইতিহাস বিরুদ্ধ মানসিকতা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন না তিনি; যা অচল তাকে বাদ দিয়ে, যা গতিশীল তাকে আরও উজ্জ্বল করে, তাঁর সুদূরপ্রসারী মননশক্তি দিয়ে তুলে ধরলেন এক উদার সমাজ-চেতনা। প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি নিয়ে এলেন নবদিগন্তের সন্ধান। একদিকে বুদ্ধের মতো অনন্ত করুণা, অন্যদিকে প্রমিথিউসের মতো বিদ্রোহী চরিত্র—এই দুইয়ের সম্মিলনে তাঁর অপূর্ব চরিত্র। তিনি বই লেখেননি, বক্তৃতা দেননি, মিছিল পরিচালনা করেননি। কান্ট-হেগেল-মিল পড়েননি। কিন্তু সাদা চোখে দেখেছিলেন লোকজীবনকে, উন্মুক্ত মন দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন সমাজকে, আর সেই সাথেই মানুষের কাছে রেখে গেলেন নারীমানসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ নবজাগরণের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

রেনেসাঁস-ভাবনা

উনিশ শতকের নবজাগরণ সম্বন্ধে বাদানুবাদ আজও শেষ হয়নি। বিভিন্ন পণ্ডিত নানান দিক থেকে এর মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। এবং নবজাগরণ বা রেনেসাঁস শব্দটির সংজ্ঞা নিয়েও এঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নবজাগরণ কি ফরাসী বিপ্লব বা শিল্পবিপ্লবের মতো কয়েকটি নাটকীয় ঘটনার সমাহার, না কোনো সমাজের আমূল রূপান্তর? রূপান্তর কি সবসময়ই নবজাগরণ? সেই সাথেই প্রশ্ন ওঠে—কোনো জাতির রূপান্তর কি সবসময়ই বহিরাগত প্রভাবে ঘটে, অথবা সেই জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও আভ্যন্তরীন চাপে ঘটে? কারো কারোর মতে দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক লোকের মধ্যে রূপান্তর দেখা না গেলে তাকে রেনেসাঁস বলা যায় না, আবার কারোর মতে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব আসার আগে পরিবর্তন আসে আদর্শ ও মূল্যবোধে, এবং রেনেসাঁসের প্রাথমিক পর্যায়ে এই রূপান্তর মুষ্টিমেয় মানুষকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছিলেন, চ্যালেঞ্জ (Challenge) এবং তাতে সাড়া দেবার (response) মধ্য দিয়েই বিভিন্ন জাতির প্রাণশক্তির পরীক্ষা হয়। প্রবল আঘাতের ফলে বহু সভ্যতা যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি আঘাতে সাড়া দেবার মতো যোগ্য মানুষের সাহায্যে বহু সভ্যতা নবজীবনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা আজ হারিয়ে গেছে। গ্রীসের রাজধানী আজও এথেন্স, কিন্তু পেরিক্লিসের এথেন্স আজ কোথায়? যে হেলেনিজম্ (Hellenism) মানবসভ্যতায় বিশেষ অবদান রেখে গেছে, বর্তমান গ্রীসে তার ছাপ কতটুকু? আজকের রোমে খুঁজে পাওয়া যায় না প্রাচীন রোমের সেই ঐতিহ্য—ক্যাপিটোল পাহাড় আজ যাদুঘরের সামগ্রী। মিশরের বলদৃপ্ত ফারাওরা আজ পিরামিডের অন্তরালে; নীলনদ সেদিনের মতো আজও বয়ে চলেছে, কিন্তু অধিবাসীরা তাদের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আজ আরবীয় ইসলামের উত্তরসাধক। আসিরিয়া, ব্যাবিলন শুধু তাদের ঐতিহ্য নয়, নাম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।

বিপরীতদিকে, বহু বহিরাগত প্রভাব ও রূপান্তরের মধ্য দিয়েও আজকের ভারত তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেনি।

নবজাগরণের মূলে যে চ্যালেঞ্জ ও রেসপন্সের ভূমিকা থাকে, তা বহিরাগত বা আভ্যন্তরীণ হতে পারে, কিংবা দুইয়ের প্রভাবই থাকতে পারে। আরব সংস্কৃতির অভ্যুত্থানে ইসলাম ধর্মের অবদান থাকলেও গ্রীস-চীন-ভারতের গভীর প্রভাব এর ওপর লক্ষ্য করা যায়, যেমন ভারতে নাগা-মিজোদের রূপান্তরে খৃষ্টানী সভ্যতার বিশেষ ছাপ রয়েছে। বিপরীতদিকে, বৌদ্ধ ভারতে যে জাগরণ তার মূলে কোনও বহিরাগত প্রভাব নয়, আভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ ও রেসপন্স-ই ছিল এর মূল শক্তি। ভেনচুরি, থোডা, রসি, রুজেরো প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে ইতালির রেনেসাঁসের মূলেও হেলেনিজম নয়, ছিল ইতালিবাসীদের নিজস্ব ঐতিহ্যের বিবর্তন।

শিক্ষিত ভারত, গ্রামীণ ভারত

ভারতীয় নবজাগরণকে অনেকেই বৃটিশ-শাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ইতিহাসের অবচেতন হাতিয়ার হিসেবে ইংরেজের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। নবজাগরণের বিভিন্ন ঋত্বিকদের দিকে তাকালে আমরা এর তাৎপর্য বুঝতে পারি। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, করাসী বিপ্লব, বৃটিশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ইওরোপীয় রেনেসাঁস, মিল-হেগেল-বেন্থামের চিন্তাধারা, এবং সেইসাথে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উপলব্ধিতেই এঁরা নবজাগরণে আগ্রহী হয়েছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মহানায়কদের পেছনে এসবের অবদান কম নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে বিষয়টি সে-রকম ছিল না। মিল হেগেল-বেন্থামের চিন্তাধারা বা ফরাসী বিপ্লব তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ-কথা কেউ বলবে না।

উনিশ শতকের বহিরাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে ভারতের যে রেসপন্স, তাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। শহুরে ও শিক্ষিত সমাজের যে রেসপন্স তার প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু এ-ছাড়াও আরেকটি সমাজ ছিল—গ্রামীণ সমাজ, যে-সমাজ রেসপন্স জানিয়েছিল তার নিজস্ব ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই। আর এই সমাজেরই প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ইতিহাসের প্রয়োজনে দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের মুখোমুখি হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—শিক্ষিত ভারতের সামনে দাঁড়িয়েছিল

গ্রামীণ ভারত। এবং এই মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়েই নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল ভারতের প্রাণসত্তা।

ডিরোজিও প্রমুখ চিন্তানায়কেরা পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে, সেখানে রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সবাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবধারা সমন্বয়ে নতুন পথ আবিষ্কারের প্রয়াসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার নিষ্কাম কর্মের ওপর জোর দিলেও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে তিনি কোঁৎ-দর্শন (Comte) পজিটিভিজমের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সাহেব সাজার চেষ্টা না করলেও ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে ইওরোপীয় দর্শন পড়ার ওপর জোর দিয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রতি প্রত্যয়শীল হলেও প্রতিমা-উপাসনা ও সন্ন্যাসকে মানেননি। অর্থাৎ সে-যুগের মনীষীরা তথা শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য বিদ্যার অধিকারী হয়ে আত্ম-আবিষ্কারের পথ ধরেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তৎকালীন ভারতের আপামর জনসাধারণ—যারা অধিকাংশই নিরক্ষর, দরিদ্র—তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এঁদের কথা উপলব্ধি করা। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের শিক্ষিত সমাজ ও নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল। অথচ এই নিরক্ষর দরিদ্র সমাজ যে সে-যুগের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে রেসপণ্ড করেছিল তার প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগেই ঘটে গেছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, কৃষক ও সাঁওতালদের বিদ্রোহ, এবং পরে ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ হয়েছে, কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে ১৮৬১-তে আসামে, ১৮৭২-এ পূর্ববঙ্গে, ও ১৮৭৪-এ দক্ষিণ ভারতে, এবং ১৮৭৭-এ নাগপুরে ও ১৮৮২-৯০ সালে বোম্বে-মাদ্রাজে ঘটেছে শ্রমিক বিদ্রোহ। এটা অবশ্য ঠিক কথা যে এই বিদ্রোহগুলির সাথে রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগরের বিদ্রোহের গুণগত পার্থক্য ছিল। এই মনীষীরা যেখানে ভারতচিন্তাকে সামনে রেখে সংগ্রামকে একটি যুক্তিসম্মত পরিণতি দিতে চেষ্টা করেছিলেন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের সাহায্যে, সেখানে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহে আঞ্চলিকতাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই- বিদ্রোহগুলির মূল কারণ ছিল কর-শ্রম-মূল্যবৃদ্ধি-দারিদ্র্য।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, আর ঐ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। একই সময়ে দেশবাসীর কাছে ডাক এসেছিল দুটি—ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার, আর ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতি আরও বেশি করে আত্মস্থ

করার। ভদ্রবাবু সমাজ প্রথমটিকে নিন্দা করে দ্বিতীয়টিকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিল। আর নিরক্ষর দরিদ্র সমাজ কৃষক বিদ্রোহ ও শ্রমিক বিদ্রোহে এগিয়ে গিয়েছিল। ফলে এক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এলিট শ্রেণীর সাথে সাধারণ মানুষের বিচ্ছেদ। একে অন্যের ভাষা বোঝেনা। শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের প্রতি সহানুভূতিহীন, অভিভাবক সুলভ ব্যবহারে মত্ত। অন্যদিকে অশিক্ষিতেরা শিক্ষিতদের কিছুটা সমীহ করে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস করেনা।

ইংরেজি শিক্ষা বর্ণিত সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই সে-যুগে কয়েকজন আবির্ভূত হয়েছিলেন যাঁরা সমস্যাকে আরও গভীরে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ, নারায়ণ গুরু। প্রথমজন উত্তর ভারতে, দ্বিতীয়জন পূর্ব ভারতে, আর তৃতীয়-জন দক্ষিণ ভারতে যুগের চ্যালেঞ্জে রেসপন্স জানালেন। পাশ্চাত্য বিদ্যার পরিবর্তে মূলত দেশজ ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়েই তাঁরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারতাত্মাকে পুষ্ট করে তোলায় দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সেইসাথে গণধর্মগুলির (folk religions) অবদান কম নয়। কেরালার নারায়ণ গুরু অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে মহান ভূমিকা নিয়ে 'এক শাস্ত্র, এক জাত, এক দেশ'-এর বাণী প্রচার করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন শাস্ত্র হিসেবে বেদের ওপর বেশি জোর দিলে অহিন্দুরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ ঐক্য খুঁজেছেন বৈচিত্র্যকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েই। তিনি বুঝেছিলেন যে রেজিমেন্টেশনের সাহায্যে যথার্থ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়না — মানব-উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে মানুষের সৃজনী এষণা হিসাবে তিনি দেখেছিলেন।

নবজাগরণের প্রশ্ন

আমাদের আলোচ্য বিষয় বাংলার নবজাগরণ। সেই যুগে যেটি আমাদের নজর কাড়ে সেটি ছিল বাঙালী-মানসের ভারতমুখীনতা। এর আগে বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলকে একসূত্রে বাঁধার নানারকম চেষ্টা হয়েছে। বুদ্ধ-অশোক-শঙ্কর-মহম্মদ এবং খৃষ্টান চার্চ চেষ্টা করেছেন ধর্মের মাধ্যমে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে, আলেকজাণ্ডার থেকে নেপলিয়ন প্রয়াসী ছিলেন যুদ্ধের মাধ্যমে।

ইওরোপে বিভিন্ন জাতিকে সম্মিলিত করার চেষ্টা আমরা দেখি প্রথমে রোম-সাম্রাজ্যের মধ্যে, পরে খৃষ্টধর্মে, এবং শেষে শিল্পায়নের (industrialisation) মাধ্যমে। পাশাপাশি ভারতে এই চেষ্টা হয়েছিল ধর্মের (বৈদিক, ইসলাম, খৃষ্টান) মাধ্যমে, ভাষার সাহায্যে (সংস্কৃত, ফারসী, ইংরেজী), এবং শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে (গুপ্ত সাম্রাজ্য, আকবর, মহম্মদ-বিন তুঘলক, ভিক্টোরীয়া)। অতএব আমাদের ভারতচিন্তা ইংরেজের দান নয়; ইওরোপীয়রা যেখানে ভাষা ও ভূখণ্ডের সাহায্যে জাতি (nation) নির্ধারণ করে, সেখানে ভারতীয়রা সংস্কৃতিকেই (culture) জাতির ঐক্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বাঙালী মানস নবজাগরণের যুগে যে শুধু নতুন করে ভারতমুখী হয়ে পড়েছিল তা নয়, সেইসাথে ব্যক্তির স্বাধিকার-বোধ সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠেছিল। মনীষীরা লক্ষ্য করেছিলেন, সে-যুগের চ্যালেঞ্জ শুধু বহিরাগত ইংরেজের মাধ্যমেই নয়, এই চ্যালেঞ্জ ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যর মধ্যেও। লোকাচার ও শাস্ত্রবিশ্বাসের মধ্যেই কী ধর্মীয় জীবন সম্পূর্ণ, অথবা জীবনের বাস্তবতায়ই ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য—এই প্রশ্ন বৃটিশ সভ্যতার মতোই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এইভাবে বাইরের ও ঘরের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল--মুক্তির পথ কি ? এরই উত্তরে কেউ সমাজ-সংস্কারে, কেউবা ধর্মান্তর গ্রহণে, কেউ নাস্তিকতায়, আবার কেউ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নে জীবনকে ঔদাসীন্যে বরণ করে নিয়েছিলেন। রামমোহন মূলত বিচারকেই অগ্রগণ্য করলেন, বিদ্যাসাগর নিলেন মানবতাকে, মধুসূদন আশ্রয় করলেন সাহিত্যের রসসৃষ্টিকে।

বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের অগণিত নিরক্ষর দরিদ্র মানুষেরই একজন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভবতারিণী-মন্দিরের পূজারী হিসেবে মাসিক সাত টাকা মাইনে, আর আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর না হলেও পাঠশালার বেশি তাঁর আনুষ্ঠানিক বিদ্যা এগোয়নি। এ-রকম একজন মানুষ, যিনি ছোটবেলা থেকেই রাম-কালী-শিব-শীতলা-মনসা ও কীর্তনের আবহাওয়ায় মানুষ, গভীর জীবন-জিজ্ঞাসাই তাঁকে সমাজ-সচেতন করে তুলেছিল। যিনি ঈশ্বরের কথায় বা কীর্তন গাইতে-গাইতে সমাধিস্থ হয়ে যান বারবার, তিনিই যখন বলেন "খালি পেটে ধর্ম হয় না", যিনি গিরিশ ঘোষকে বলেন "নাটক ছেড়ো না, ওতে লোকশিক্ষা হচ্ছে", যিনি বলেন

"চালকলাবাঁধা বিদ্যে চাই না", যিনি প্রশ্ন করেন, "ব্রাহ্মণের পরিচয় তার উপবীত, না তার সত্যনিষ্ঠা" তিনি যে সমাজ সচেতন ছিলেন এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। ভাবতারিণী মন্দিরে পূজারী হিসেবে প্রথমদিনেই দেবীমূর্তি দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—"সত্যিই কি এ চিন্ময়ী, না মৃন্ময়ী মাত্র?" এই প্রশ্ন জেগেছিল রামমোহন-ডিরোজিও-দেবেন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের মনেও। কিন্তু এঁরা সবাই ছিলেন পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত। বিপরীতদিকে, আবাল্য দেব-দেবী ও কীর্তনের পরিবেশে যিনি মানুষ, যাঁর মা-বাবা গভীর ধর্মবিশ্বাসী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের মনে এ-ধরনের প্রশ্ন উঠতে দেখে আমরা বুঝতে পারি যে গভীর জিজ্ঞাসাই তাঁর জীবনকে রূপান্তরিত করেছিল। ব্রাহ্মণদের আপত্তি সত্ত্বেও কৈবর্ত রাণী রাসমণির মন্দিরে চাকরী গ্রহণ করা, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কামারণী মহিলার হাত থেকে উপনয়নের পর প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করা, নারীকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করা ইত্যাদি ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা। আবার যখন দেখি দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকছেন "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়", যখন দেখি তিনি নিজেই যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের বাড়ি, স্বীয় সহধর্মিনী, গৌরীমা, নরেন্দ্র-নাথ প্রমুখকে বলেছেন লোকশিক্ষায় ব্যাপৃত হতে, তখন বোঝা যায় ধর্মের সাথে সোসাল কমিটমেণ্টের মিলন চাইছেন তিনি। তাঁর ভাষায়: "পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আত্মসার—'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ করে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়।"

মুক্তি কোন্ পথে—এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্রয় করলেন বুদ্ধিবৃত্তিকে। যুক্তি-বিচার ও বিজ্ঞানবুদ্ধির অস্ত্রে সমস্ত সংশয় দূর করে তিনি মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মানবতাবাদ ব্যবহারিক বুদ্ধিধর্মে রূপ নিয়েছিল, যার ফলিত রূপ অনুশীলন ধর্ম। বিদ্যাসাগরের মধ্যে সেই মানবতা-বাদ রূপ নিলো হৃদয়বৃত্তিতে। গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসার অনুসারী তিনি ছিলেন না, বরং মানুষের কল্যাণকর কাজে, মানুষের প্রতি সমবেদনায় তাঁর হৃদয় ছিল উদ্বেলিত, বিভিন্ন সমাজ কর্মের মধ্য দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত শিল্পী—ছবি আঁকা বা গান গাওয়ার শিল্পী নন, জগৎ

সম্বন্ধে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছিলেন তিনি। এই শিল্পচেতনার উৎস ছিল উপনিষদের কাব্যময় শ্লোকগুলি যার প্রতীক তিনি খোঁজার চেষ্টা করতেন সর্বত্র—দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে বীরভূমের রুক্ষ প্রান্তরে। এভাবে বুদ্ধি, হৃদয়, ও শিল্পের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ। এই তিনটি বৃত্তির জাগরণ আমরা রেনেসাঁস-যুগের ইওরোপেও দেখতে পাই।

এই মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথকে যেতে হয়েছে মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, সে-যুগের শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই যে দ্বন্দ্ব অনুভব করেছিলেন। সেই দ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপ কি ছিল ? মূলত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথের যে স্বধর্মপ্রীতি তা আসলে স্বজাতিপ্রীতিরই প্রকাশ, বিদ্যাসাগরের ধুতি-চাদর-চটীও তাই। জাতীয়তাবোধ তখন এক বড় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান সভ্যতার আকর্ষণ। এই দুইয়ের দোলাচলে মনীষীত্রয়ের সামনে দেখা দিয়েছিল আত্মসত্তা আবিষ্কার তথা আইডেন্টিটির (identity) সমস্যা। নিজস্ব সংস্কৃতিকে বজায় রেখেও কিভাবে বিশ্ব-সংস্কৃতির শরিক হওয়া যায়,তারই নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা এঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজীতে লেখা আত্মীয়ের চিঠি যখন দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়ে দেন না পড়েই, বরণ করে নেন উপনিষদকে, কেশব সেনকে সতর্ক করে দেন মাত্রাহীন খৃষ্ট-প্রীতি থেকে, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় দেবেন্দ্রনাথের মনে ভারতীয়ত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। সেইসাথেই দেখা গেছে যে প্রতিমা-উপাসনা ও সন্ন্যাসকে না মেনে তিনি তাঁর ধর্মান্দোলনকে ভারতীয় জীবনদর্শনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ থেকে সরিয়ে এনেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা, গীতার নিষ্কাম কর্মের অনুরাগী, আবার তিনিই সন্ন্যাসকে 'অসম্পূর্ণ ধর্ম' বলেছেন, বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে বহু কাটছাট করে 'মার্জিত' করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর পোশাকে যেমন জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়েছেন, আবার তেমনি বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে 'ভ্রান্ত' বলেছেন।

আসলে এঁদের সমস্যাটা ছিল আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের (identity crisis)। সমাজে নিজস্ব স্থিতি নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিলেই মানুষের মধ্যে সত্তা সংশয় বা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস দেখা দেয়। এঁরা নিজেদের পুরোপুরি ভারতীয় ভাবতে চেয়েছেন, কিন্তু দেশজ ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে স্বীকার না

করায় আপামর জনসাধারণের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। ফলে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত পরিণত হলো শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ধর্মে, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই। জনসাধারণের ধর্ম যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় নেই, তেমনি তাঁর উপন্যাসগুলিতেও প্রধানত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরাই নায়ক-নায়িকা হিসেবে এসেছে; তিনি ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রতি যতটা অনুরক্ত ছিলেন, বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি সম্বন্ধে ততটা নন। বিদ্যাসাগর মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সেইসাথেই লক্ষ্যণীয় যে তিনি সবসময়ই একক সংগ্রামী—জনসাধারণকে সাথে নিয়ে তিনি কোনো জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে যেতে পারেননি। এর ফলে সমাজসংস্কারের জন্য তিনি সরকারী আইন প্রণয়নের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর তাঁদের নবচিন্তা-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আন্দোলনের ধারক-বাহকদের সংহত করে যেতে পারেননি, আর দেবেন্দ্রনাথের চোখের সামনেই ব্রাহ্মসমাজ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, আন্দোলনের জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। মানুষকে ভালবেসেও এই মনীষীত্রয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিলেন অভিজাত। আভিজাত্যের এই গর্বই তাঁদের নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। নিরক্ষর দরিদ্র ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিতদের যে মনোভাব তা ছিল অভিভাবকসুলভ। বঙ্কিমচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের সাথে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে এই দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন ধুতি-চাদর পরে ব্রাহ্মোৎসবে যেতে। হঠাৎ এ-ধরণের প্রস্তাবের কারণ কি? শ্রীরামকৃষ্ণ তো দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের বাড়িতে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন বেশে যাননি! কেউ যদি নিমন্ত্রণ করার সময় আমন্ত্রিতকে জামা-কাপড় পরে যেতে বলেন তবে আমন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেন 'মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি?' বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দেন: আহার-নিদ্রা-মৈথুন। এটি তাঁর রসিকতা নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রথম আলাপে কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সাথে এ-ধরণের রসিকতা চলে কি? সব রসিকতারই স্থান-কাল-পাত্র থাকে। আসলে, তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ গ্রামীণ মানুষদের ঠিক সমদৃষ্টিতে দেখতেন না, কিছুটা করুণার চোখেই দেখতেন। এই আভিজাত্যের গর্ব ও অভিভাবকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের নিঃসঙ্গতার মূল কারণ।

জাতির জীবনে যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস দেখা দিয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমাধান করলেন জাতিকে তার নিজের প্রতি আস্থা এনে। (রোমাঁ রোলাঁ তাঁর প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "ত্রিশ কোটি ভারতীয়ের গত পাঁচ হাজার বছরের সাধনার ঘনীভূত রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ।") সত্যিই তাই। উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র মানুষ যিনি নিজের জীবনে জাতির গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। শুধু পোশাকে-খাদ্যে-জীবন-যাত্রায়ই নয়, বিশ্বাস-রুচি-সংস্কার-কল্পনায়ও তিনি সাধারণ মানুষের শরিক। গত কয়েক হাজার বছরে জাতি যত কথা ভেবেছে, তার অনুভূতি-উপলব্ধি, কিছুই হেলায় বাতিল করেন নি তিনি, বরং নিজের জীবনে তাকে সমন্বিত করেছেন; একদিকে যেমন বাংলার লোকঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করেন নি, অন্যদিকে তেমনি দ্রাবিড় ও আর্য সংস্কৃতির বারিধারায় স্নান করে উঠেছেন, আবার তিনিই একাত্ম হতে চেয়েছেন আরব মরুভূমির মানুষ ও পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ মানুষদের সাথে। এই একাত্ম হতে চাওয়াটা নিছক বৌদ্ধিক নয়, 'জীবনে জীবন যোগ করা'র মাধ্যমে মানুষের অন্তরাত্মাকে তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। আর এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বজনীন মানুষ। তবে তিনি ধর্মীয় পরিভাষায় কথা বলেছিলেন, যেমন হেগেল কথা বলতেন দার্শনিক পরিভাষায়, নিউটন বিজ্ঞানের পরিভাষায়।

সন্তানকে মানুষ করে তোলার ব্যাপারে মা ও বাবার ব্যবহারে কিছুটা পার্থক্য থাকে। সন্তানের দোষত্রুটিকে পিতা যেখানে কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে দূর করতে চান, মা সেখানে সেই কাজ করেন ভালবাসার দ্বারা। পিতাকে আদর্শ বলে মেনে নিলেও সন্তান তাই তার সাথে সবসময় একাত্ম-বোধ করেনা, দূর থেকে তাকে শ্রদ্ধা জানায়। আর মা ছেলেকে মারলেও ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদে, মা তার কাছে সবচেয়ে আপন, সে জানে তার শত অপরাধকেও মা ক্ষমা করতে রাজি। বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ জাতির সামনে পিতার ভূমিকা পালন করে গেছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়েছিলেন মায়ের ভূমিকা। আর এজন্যই আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও দেশবাসীর কাছে বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণই বেশি আপনজন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) জীবনের এক সংকট মুহূর্তে যখন আত্মহত্যার কথা চিন্তা করছেন, তখনই শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে দেখা হয় তাঁর। আত্মহত্যা আর করা হয়নি, শ্রীম নতুন জীবনের সন্ধান

পেয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষ সে যুগের বিখ্যাত নাট্যকার-অভিনেতা ও সেই সাথেই দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। তাঁর নাট্যপ্রতিভায় মানুষ যেমন চমৎকৃত তেমনি তারা 'মদ্যপ লম্পট বাগবাজারের গিরিশ'কে ভয়ও করে। 'উচ্ছৃঙ্খল' গিরিশকেও নতুন জীবনের স্বাদ দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যেমন দিয়েছিলেন নটী বিনোদিনীকে। সমাজ যাদের ঘৃণা করে তারাও তাঁর কাছে এসে উপলব্ধি করল যে তাদের জীবন ব্যর্থ নয়, এ জীবনেও নতুন করে ফুল ফুটতে পারে। শ্রীম ও গিরিশ ঘোষকে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থেকে রক্ষা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। জাতির জীবনেও একই ভূমিকা তাঁর। বিদেশী সংস্কৃতির আক্রমণ ও স্বদেশী বুদ্ধিজীবীদের অতিবিপ্লবী পন্থায় জাতি তখন নিজস্ব ঐতিহ্যে আস্থা হারাতে বসেছিল, স্বীয় ভূগোল-ইতিহাসকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জাতিকে সেই শ্রদ্ধাহীনতা থেকে বাঁচালেন, জাতির মনে আত্মশ্রদ্ধা জাগালেন। এইভাবে তিনি যে গভীর সঙ্কট থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচিয়ে-ছিলেন, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কত গভীর সেটি আমরা বুঝতে পেরেছি আরও বেশি করে যখন পরবর্তীকালে ইউং (Jung) ও এরিকসনের (Erickson) মতো মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। ইউংয়ের মতে, জাতি যখন তার নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয় তখনই সমাজে দেখা দেয় সাইকোলজিক্যাল নিউরোসিস (Psychological neurosis); আর এরিকসন বলেছেন যে জাতির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জের সমাধানে ঐতিহ্য (tradition) যদি ব্যর্থ হয় তখনই অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে, ঐতিহ্যসম্মত পথে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলাতেই জাতি আত্মস্থ হয়ে ওঠে। অথচ বিনা প্রশ্নে কোনো কিছুকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন তাঁর কাঞ্চন-ত্যাগের পরীক্ষা নিচ্ছেন, সমাধিস্থ অবস্থায় ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করছেন, মথুরবাবু ও যোগীন পরীক্ষা করছেন তিনি সত্যিই কামজয়ী কিনা, প্রতিবারই শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দের সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন পরীক্ষা দিতে, এদের উৎসাহ দিয়ে বলছেন "এই তো চাই, বিনা প্রমাণে কিছু মেনে নিবি না। বিচার করে, যাচাই করে তবে গ্রহণ করবি।" ব্রাহ্ম-ভক্তদেরও বলেছিলেন তিনি, "না বুঝে গ্রহণ করা! এ তো কপটতা।" আসলে দেশাচার ও লোকাচার তিনি সম্পূর্ণ বাতিল করে না দিলেও এসব আচারের গড্ডলিকা প্রবাহে তিনি গা ভাসিয়ে দেননি।

সেই সাথেই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে দৈবশক্তির প্রাধান্য আর ঈশ্বরপ্রীতি এক

জিনিস নয়। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সামনে এক ভক্ত যখন বলেছিল 'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা' তখন তীব্র প্রতিবাদ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠেছিলেন, "কি করে বুঝলে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা আর ওটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়? ঈশ্বরের ইচ্ছাই যদি বলো তবে তোমার ছেলে যখন মারা যায় তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন?" উপলব্ধিবিহীন শাস্ত্রকথাকে তিনি মেনে নেননি। তরুণ শিষ্য হরিনাথকে তাই তিনি বলেছিলেন, "বলছো বটে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু হাতে কাঁটা ফুটলেই উঃ করে উঠছো! শুধু মুখে বললে কি হবে? সাধন চাই।" ভারতীয় ইতিহাসে ভক্তিবাদের দুটি ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি—একদিকে যেমন ভক্তির মাধ্যমে নানক-কবীর-তুলসীদাস-তুকারাম-শ্রীচৈতন্যের মতো মহাপুরুষ এদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অন্যদিকে এই ভক্তিই সময়ে-সময়ে জাতির জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে, মানুষকে দীন-হীন করে ফেলেছে। দোষটা ভক্তির নয়, ভক্তির অপব্যবহারের। যারা ভক্তি বলতেই দীন-হীন ভাব বোঝেন, তারা ভুলে যান নানকের ভক্তিবাদ নিয়েই দুর্দম শিখজাতি জেগে উঠেছে, যে শ্রীচৈতন্য অধিকাংশ সময় সমাধিস্থ থাকতেন তিনিই নবদ্বীপের কাজীর অন্যায় নির্দেশের প্রতিবাদ করার জন্য দশহাজার লোকের মিছিল নিয়ে কাজীর বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন। ভক্তির এই বলিষ্ঠ দিকটির কথা ভুলে সাধারণ মানুষ ভক্তিকে সময়-সময় নামিয়ে আনে বৈষয়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থতায়, বারবার প্রার্থনা করে দৈবশক্তির অনুগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিকে মেনেছেন, কিন্তু সেইসাথেই ধিক্কার দিয়েছেন ঈশ্বরের কাছে 'লাউ-কুমড়ো' চাওয়ার জন্য। ভক্তির নামে ছেলের চাকরী, মেয়ের বিয়ে, রোগ আরোগ্য, শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদিকে ধিক্কার দিয়ে বারবার তিনি বলেছেন "ঈশ্বরের কাছে কিছু চেওনা", তুলে ধরেছেন অহৈতুকী ভগবৎ প্রেমের কথা।

ব্যক্তিত্বের দুই রূপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে ব্যক্তিমানুষের যে বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল একান্ত কাম্য, কিন্তু ইতিহাস চেতনার অভাবে এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ অহঙ্কারে (ego) পরিণত হচ্ছিল। গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনে যখন নগর সভ্যতার উদ্ভব হলো তখন মানুষের গোষ্ঠীচেতনা (ethnic affiliation) কিছুটা দূর হলো ঠিকই, কিন্তু গড়ে উঠল নতুন ধরণের গোষ্ঠীচেতনা, যার ভিত্তি সামাজিক-

রাষ্ট্রীয়-জাতীয়-শ্রেণীগত-ভাষাগত চেতনা। আজকের পৃথিবীতে এই বিষয়টি সহজেই চোখে পড়ে। এই যে বিভিন্ন ধরণের চেতনা, এরই সাথে মানুষ একাত্মবোধ করে এবং এভাবেই সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে অসংখ্য দল-উপদলে। হিটলার থেকে মার্কস কেউই এর ব্যতিক্রম নন। এইভাবে মানুষের অহঙ্কার নতুন নতুন রূপে সজ্জিত হয়, নিজেকে সে মনে করে শ্রেষ্ঠ আর অন্যদের নিকৃষ্ট। এভাবেই মানব-মহাসাগরে গড়ে ওঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, সংঘর্ষের বীজ থেকে যায় মানুষের মধ্যেই। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন 'কাঁচা আমি'; একে নিন্দা করে তিনি মানুষকে বলেছেন 'পাকা আমি'কে বরণ করে নিতে। তিনি নিজে কখনও এই 'কাঁচা আমি'র গণ্ডীতে বদ্ধ হননি, বলতেন যে গুরু-কর্তা বাবা এই তিন শব্দে তাঁর পায়ে কাঁটা ফোটে। তিনি তাঁর ব্রাহ্মণ অহংকার দূর করেছেন কামারনী মহিলার হাত থেকে ভিক্ষা নিয়ে, কৈবর্ত নারীর অধীনে চাকরী নিয়ে, পৈতে ফেলে ধ্যান করে, নিজের মাথার চুল দিয়ে ঝাড়ুদারের পায়খানা পরিষ্কার করে। তিনি তাঁর ধর্মীয় গণ্ডীকে অতিক্রম করেছেন বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করে। সে-যুগের ভদ্রলোকী নীতিবাদের ছুঁৎমার্গ পরিত্যাগ করে তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন মদ্যপ দানা কালীকে, গৃহভৃত্য লাটুকে, নটী বিনোদিনীকে, রসিক মেথরকে। কোনোরকম মতান্ধতার গণ্ডীতেও তিনি আবদ্ধ হতে রাজি হননি, বারবার বলেছেন "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি"। "যত মত তত পথ" উক্তির মাধ্যমে মানব-উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এভাবে সব-রকম কাঁচা আমি'র (ego) থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সত্যকে বরণ করে নিতে চেয়েছেন। উপাস্য দেবীর পায়ে ফুল দিয়ে বলেছিলেন : মা, এই নে তোর পাপ-পুণ্য, শুচি-অশুচি, ধর্ম-অধর্ম। কিন্তু বলতে পারলেন না 'এই নে তোর সত্য'। ভক্তদের বলেছিলেন : ভাবলুম সত্যকে বিসর্জন দিলে দাঁড়াবো কোথায় ? গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ এই ঘটনাটি। ধর্ম-অধর্ম, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি যে মূল্যবোধ তার সবকিছুকেই তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন, পরীক্ষা করলেন, প্রচলিত মূল্যবোধকে আপ্তবাক্য বলে মেনে না নিয়ে সেগুলির বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন, শুধু ধরে রাখলেন সত্যকে। যখন সমস্ত গোষ্ঠী-চেতনা বা কাঁচা আমি'র হাত থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ শুধু সত্যেরই অনুসন্ধান করে তখনই সে মুক্তমতি হতে পারে, সার্থক বিপ্লবী হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সত্যের সাথেই নিজের আইডেন্টিটি (identity) খুঁজে পেয়েছেন, পাকা আমি'র

সাধনাই তিনি দেখিয়ে গেছেন। তিনি তাই মানুষকে আত্মবিস্মৃত হতে দিতে চাননি সেই আত্মবিস্মৃতি শূন্যবাদেই পর্যবসিত হোক কিংবা সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয়-জাতীয়-শ্রেণীগত ভাষাগত সত্তায় বিলীন হোক—তিনি মানুষের যথার্থ আত্মবিকাশ চেয়েছিলেন। ("মান হুঁশ যে সে-ই মানুষ"—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। নিজের 'মান' অর্থাৎ আত্মশ্রদ্ধা ও স্বকীয় স্বাধীন সত্তা সম্বন্ধে যে হুঁশ (conscious, aware) তাকেই মানুষ বলেছেন তিনি। গুরু কে? এই প্রশ্নে তিনি সেই সিংহের গল্প শোনাতেন।) ঘটনাক্রমে এক সিংহশাবক শিশুবয়স থেকেই ভেড়ার দলে মিশে নিজেকে ভেড়া বলে ভাবতো, ঘাস খেতো, ভ্যা-ভ্যা করতো। একদিন এক সিংহ তা দেখতে পেয়ে ঐ শাবকটিকে ধরে নিয়ে এসে বললো: কি ভ্যা-ভ্যা করছিস! ত্যাখ আমার মুখের দিকে, আর এবার নদীর জলে নিজের মুখের ছায়া ত্যাখ। অবাক হয়ে সিংহশাবকটি জীবনের অন্য মাত্রা (dimension) চেয়ে দেখলো; সিংহটি তখন তার মুখে গুঁজে দিলো রক্তমাখা এক টুকরো মাংস। সেই স্বাদে তার হারানো সত্তাকে খুঁজে পেলো শাবকটি, নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ হলো, তার গর্জন চারদিক কাঁপিয়ে তুললো। (শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, গুরু হলো ঐ সিংহটি যে শিষ্যের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে, মানুষের অসীম সম্ভাবনাময় সুপ্ত শক্তি সম্বন্ধে যিনি মানুষকে সচেতন করে তোলেন।)

অনুশাসন ও মুক্তমতি

দেশাচারের শৃঙ্খলে মানুষ যখন ধর্মের মূল তাৎপর্য ভুলে গিয়েছিল, সেই যুগে রাজা রামমোহন উদ্ধার করতে চাইলেন শাস্ত্রবাক্যের মর্মকথা। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার ধর্মকে প্রধান স্থান দিয়েও লিখলেন, "ধর্মের গূঢ় মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয়জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়। এই অনুশীলন ধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহা যে হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশি ভরসা আমি রাখিনা।" দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে নিয়েছিলেন, আর বিদ্যাসাগর ধর্ম নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেও বারবার চেষ্টা করেছেন শাস্ত্রকে যুক্তি হিসেবে তাঁর আন্দোলনের স্বপক্ষে দাঁড় করাতে।

এঁদেরই পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ নিলেন এক ভিন্ন পথ। তিনি শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে প্রধান স্থানে বসালেন না; বিশেষত তিনি যখন বলেন "কলিতে

বেদ মত চলে না" কিংবা "ভুল কোন্ ধর্মে নেই ?" তখন তাঁর 'দুঃসাহস' দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ধর্মকে আশ্রয় করে নবজাগরণের অঙ্কুর দেখা দিল তখন যে মৌল প্রশ্নটি উঠেছিল তা হলো—ধর্ম বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে সেই সংশয়ের নিরাকরণ করবে কে কিভাবে ? ইওরোপীয় রেনেসাঁসেও এ-প্রশ্ন উঠেছিল। একদল ধর্মকে শাস্ত্রপ্রামাণ্যের ওপর স্থাপন করতে চাইলেন, না হলে সমাজের ঐক্য নষ্ট হবে। অন্যদল বললেন স্ব-অনুভূতিই ধর্মের ভিত্তি, নতুবা এটি অন্ধ অনুকরণ মাত্র। শাস্ত্র-প্রামাণ্য বজায় রাখতে গিয়ে এবং সেইসাথে স্বাধীন চিন্তার সাহায্য নিতে গিয়ে শাস্ত্রকে নিজস্বভাবে ব্যাখ্যার একটি ধারা বহু যুগ থেকেই এদেশে ছিল, নিদর্শন শঙ্কর, রামানুজ, রামমোহন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ মূলত এই ধারারই পথিক। আর অন্য ধারার প্রবর্তকদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধ, কপিল, গঙ্গেশ উপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ ধারার পথিক ? দেবেন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "বললুম… আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও। তখন বেদ থেকে কিছু শুনালে। বললে এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত আর জীব হয়েছে এক একটি ঝাড়ের দীপ। আমি পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐরকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিল দেখে ভাবলুম, তবে তো [দেবেন্দ্র] খুব বড় লোক।" এই সামান্য কথাতেই বুঝে নেওয়া যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শাস্ত্রের চেয়েও বড় নিজস্ব উপলব্ধি।

ইওরোপীয় রেনেসাঁস ও শ্রীরামকৃষ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পাশ্চাত্য দর্শন ও যুক্তি-বিচারের মাধ্যমে মানবতাবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন, সেখানে বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদের উৎস তাঁর হৃদয়বৃত্তি ও স্বজ্ঞা। অনুরূপভাবে, দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রের ভিত্তিতে যেমন বুঝে-ছিলেন জীবনের স্পর্শে সত্য ও আদর্শকে বাস্তব করে তুলতে হয়, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ একই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তাঁর হৃদয় ও স্বজ্ঞার সাহায্যে। এই স্বজ্ঞা সবসময় যুক্তিকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না, আবার এটি যুক্তির বিরোধীও নয়। মানুষের চেতনার এক বিশেষ স্তরে এই-স্বজ্ঞা মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই স্বজ্ঞার সাহায্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন লোকচেতনাকে পাঠ করতে পেরেছিলেন, তেমনি 'কাঁচা আমি'র বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 'পাকা

আমি'তে রূপান্তরিত হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এ-দেশের নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণের এই স্বজ্ঞা-নির্দেশিত দিকগুলি এতক্ষণ আলোচনা করা হলো, 'মানবচেতনার ব্যাপ্তি ও শ্রীরামকৃষ্ণ' অধ্যায়েও তা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে—তিনি যদি সত্যিই লোক-চেতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে থাকেন, অন্তরের দিক থেকে তিনি যদি সত্যিই বিশ্বজনীন মানুষ হন, তবে যে সমস্ত মৌল সমস্যা নিয়ে তৎকালীন ইওরোপের মনীষীরা চিন্তা করেছেন, যা মূলত আন্তর্জাতিক সমস্যা, সে-সব প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বজ্ঞা কোন্ পথ দেখিয়েছে?

মধ্যযুগীয় ইওরোপের লোকজীবনকে নিষ্পেষিত করে তুলেছিল এক সাঁড়াশি যার এক বাহুতে সম্রাট-রাজা-সামন্তপ্রভু, অন্য বাহুতে পোপ-বিশপ-প্রীস্ট। এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল অকল্পনীয়। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে রেনেসাঁস এই চিন্তায় ঝড় তুললো, ধর্মশাস্ত্র ও রাজশক্তির অধিকারকে অস্বীকার করে ব্যক্তিমানুষের মুক্তির কথা ঘোষিত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আক্ষরিক অর্থে ইওরোপীয রেনেসাঁসের উত্তরসূরী নন! কিন্তু তাঁর জীবনের বিদ্রোহী সত্তা বারবার তৎকালীন সমাজকে নাড়া দিয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কামারনী মহিলার হাত থেকে ভিক্ষা গ্রহণ, কৈবর্ত নারীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজারীর পদ গ্রহণ, ইত্যাদি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। গুরু তোতাপুরীর নির্দেশ লঙ্ঘন করে নির্বিকল্প সমাধির পরও ঈশ্বরের নামগান করতে ছাড়েননি (যেজন্য তোতাপুরী ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন: কেয়া, রোটী ঠোকতে হো?), আবার তার আগে আরেক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশ সত্বেও তোতাপুরীর কাছে যাওয়া-আসা বন্ধ করেননি। দীর্ঘ বারো বছর সাধনাকালের প্রথমদিকে কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে দীক্ষা নিলেও গুরুসঙ্গলাভ তাঁর বিশেষ ঘটেনি। ফলে নিজস্ব পথেই তিনি সাধনা চালিয়েছিলেন। পৈতে ফেলে দিয়ে ধ্যান করা, টাকা-মাটি মাটি-টাকা বলে দুটোই গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া, মাথার চুল দিয়ে ঝাড়ুদারদের পায়খানা পরিষ্কার করা—এসব সাধনার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, এ তাঁর নিজস্ব সাধনশৈলী। এই নিজস্ব পথে সিদ্ধিলাভ করার পর তিনি ক্রমে গুরুবরণ করেছেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী প্রমুখ আচার্যকে। আবার ইসলামধর্ম সাধনের সময় তিনি একজন মুসলমানকে গুরুপদে বরণ করেছেন, দিনে পাঁচ-বার নামাজ পড়েছেন, ইসলামী অনুশাসন পালন করেছেন, কিন্তু খৃষ্টধর্মের

সাধনায় ব্যাপ্টাইজড্ হওয়া বা রবিবারে চার্চে যাওয়া কিংবা অন্যান্য চার্চ-অনুশাসন মানেননি। অর্থাৎ বিভিন্ন সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি যে-বিষয়টি তুলে ধরলেন তা হলো, সত্যদ্রষ্টা আচার্যকে অনুসরণ করে যেমন সত্যকে জানা যায়, তেমনি কাউকে অনুসরণ না করে শুধু আন্তরিকতাকে সম্বল করে স্বাধীন ভাবেও সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। এভাবে তিনি দেখালেন, শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা পোপ-বিশপ-খ্রীস্টই শেষ কথা নন, মানুষ স্বাধীনভাবে সত্যের মুখোমুখি হতে পারে। বিপরীতদিকে, রাজশক্তির তোয়াক্কাও তিনি করেননি। রাণী রাসমণিকে তিনি প্রকাশ্যে চড় মেরেছেন (সেযুগে কলকাতায় রাণী রাসমণিই ছিলেন একমাত্র জমিদার যিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নেমেছিলেন গঙ্গায় বৃটিশ জাহাজের চলাচল বন্ধ করে দিয়ে, নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে, নিজের হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে বৃটিশ সৈন্যের পথ রোধ করে। কলকাতার অন্যান্য জমিদারেরা তখন বৃটিশের তোষামোদেই ব্যস্ত ছিলেন।) দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার মথুরবাবুকে মুখের ওপর কথা শুনিয়ে দিয়েছেন ও মারতে ছুটেছেন একাধিকবার, এমন-কি জোড়াসাঁকোর জমিদার-বংশীয় রাজা সৌরীন্দ্র ঠাকুরকে মুখের ওপর বলে দিয়েছেন "তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারবো না, কেননা সেটা মিথ্যা বলা হবে।" এসব ঘটনাই শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্রোহী চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে, ধর্মযাজক ও রাজশক্তিকে মেনে নেওয়া নয়, বরং প্রয়োজন হলে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বকীয় সত্তাকে তুলে ধরেন নির্ভীকভাবে। এবং এভাবেই ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে যান শ্রীরামকৃষ্ণ।

মানুষের স্বাধীনতার এই দাবী যা তিনি ধর্মীয় পরিভাষায় প্রকাশ করেছেন, ইওরোপীয় রেনেসাঁসের উদারতাবাদে (liberalism) সেটিই প্রকাশিত হয়েছিল দার্শনিক পরিভাষায়। মতান্ধতার বিরুদ্ধে বারবার ক্ষোভ জানিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্যের কোনো মনোপলী (monopoly) দাবী করেননি তিনি। কাশীপুরে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে রোগজীর্ণ শরীরে যখন শেষশয্যা নিয়েছেন তিনি, সে-সময় একদিন তাঁরই কাছে বসে কয়েকজন ভক্ত ও অনুরাগী নিজেদের মধ্যে দার্শনিক আলোচনা করছিলেন। একজন হঠাৎ বলে উঠলেন: জানি জানি, ওসব আমার জানা আছে। কথাটি শুনেই উঠে বসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শয্যা থেকে! বক্তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সব জানি—ও কি কথা! ও কথা বলতে

নেই। যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" তিনি বুঝেছিলেন, উপলব্ধির শেষ নেই, নিত্য নতুন বিচিত্র পথে সত্যের প্রকাশ ঘটে। 'যত মত তত পথ' উক্তিটি মানব-উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় প্রকাশকে যেমন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানায়, তেমনি ঘোষণা করে যে সত্য কোনও কিছুতে সীমাবদ্ধ (exclusive) হয়ে থাকতে পারে না, সত্য কোথাও শেষ (exhausted) হয়ে যেতে পারে না। বারবার তাই রামকৃষ্ণ বলেছেন : মতুয়ার বুদ্ধি করো না। 'মতুয়া' অর্থাৎ একটি মতে যে বিশ্বাসী, মতান্ধ। মতান্ধতাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেছিলেন "সবাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে।" চারজন অন্ধের হাতি দেখার গল্প বলতেন তিনি। যে হাতির পেটে হাত দিয়েছিল সে মনে করেছিল হাতি একটা জালার মতো, কানে হাত দিয়ে আরেক অন্ধ ভেবেছিল হাতি কুলোর মতো, পায়ে হাত দিয়ে তৃতীয়জন বলেছিল যে হাতি থামের মতো। এদের উপলব্ধি পুরোপুরি মিথ্যা নয়, আংশিক সত্য, সবার অভিজ্ঞতা নিয়েই হাতির আসল চেহারা বোঝা যায়। তাই গল্প বা কথাগুলির মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাৎপর্য তুলে ধরেছিলেন, ইওরোপীয় উদারতাবাদী জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ সেই একই বক্তব্য রেখেছেন তাঁর On Liberty বইয়ে। ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কারণ হিসেবে তিনি দুটি যুক্তি রেখেছিলেন। প্রথমত, কেউই নিজেকে অভ্রান্ত বলে দাবী করতে পারেনা, এবং যেহেতু বিরোধী মতেও সত্য থাকা সম্ভব অতএব বিরোধী মতকে দমন করা অনুচিত। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতাই যেহেতু সীমাবদ্ধ, অতএব বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই উচ্চতর সত্যের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। মতান্ধ সর্বজ্ঞতার দাবীকে ধিক্কার দিয়ে ইওরোপীয় মনীষীরা বিভিন্ন মতবাদকে সশ্রদ্ধ চিত্তে বিচার করতে ও সেগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা এ-কাজে যুক্তির আশ্রয় নিতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে শুধু যুক্তি-বিচারের সাহায্যে নয়, বিভিন্ন মানুষ কোন্ আকুতি থেকে ঐসব সিদ্ধান্তে আসছে তা উপলব্ধি করা দরকার। তাই তিনি সাধনার মাধ্যমে একদিকে যেমন ভারতীয় মননসমূহের আবেগকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আরব মরুভূমির অধিবাসীদের এবং শিল্পোন্নত পাশ্চাত্যবাসীদের হৃদয়কে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় চিন্তানায়কেরা ভারত বা প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে

বিচার করতে গিয়ে অনেক সময়ই ভুল করেছিলেন, কারণ তাঁরা যে-যুক্তিতে আশ্রয় করেছিলেন সেই যুক্তি ইউরোপীয দেশ কালে আবদ্ধ। ফলে তাঁদের বিচারধারা (methodology) প্রাচ্য-আবিষ্কারে অনেক সময়ই ভুল করেছে। যেমন জাতি (nation), ধর্ম (religion) ইত্যাদি শব্দগুলি প্রাচ্যে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়, পাশ্চাত্যে অন্য অর্থে। তাই দেশ-কালের পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না করে নিজস্ব যুক্তি ও বিচারধারা নির্বিচারে প্রয়োগ করতে গেলে ভুল হবেই। সেজন্য শুধু মস্তিষ্ক দিয়েই নয়, কোনো জাতিকে বুঝতে গেলে হৃদয়ের অনুভূতির সাহায্য নেওয়াও দরকার। ইওরোপীয় চিন্তানায়কেরা যে যুক্তিধারার উদ্ভাবন করেছিলেন, তার সাথে হৃদয়ের উপলব্ধিকে সংযুক্ত করে 'জীবনে জীবন যোগ করা'র মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ যুক্তি-বিচারের এক নতুন ডাইমেনশুন্ তুলে ধরলেন।

ইওরোপের রেনেসাঁস স্বাধীনতাকে তুলে ধরতে চাইলো। বললো স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। এরই ফলে নতুন সমাজব্যবস্থা ও নিয়ম-নীতির উদ্ভাবন ঘটল। কিন্তু সেইসাথেই ব্যক্তি-বিকাশ উগ্র ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটালো। একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, অন্যদিকে অহংবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ রেনেসাঁসকে অন্য পরিণতির দিকে এগিয়ে দিল। ফলে রাজা ষোড়শ লুইয়ের বদলে দেখা গেল সম্রাট নেপোলিয়ন্‌কে, এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অধিকার নারী সমাজের গভীরে গেল না। এরই পরিণতিতে আরও পরে ইতালীতে মুসোলিনী, জার্মানীতে হিটলার, ফ্রান্সে দ্যগল দেখা দিলেন; নীৎসের অতিমানব-এ পরিণত হলেন মার্কসীয় সমাজ-তন্ত্রের নেতারা। এক ধরণের আত্মবিলুপ্তি থেকে অন্য ধরণের আত্মবিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন, ব্যক্তিকে সমাজ পরাধীন করতে পারে কারণ ব্যক্তির মধ্যেই দুর্বলতার বীজ রয়ে গেছে, রাষ্ট্রীয় অহং আসলে ব্যক্তিমানস-অহংয়েরই প্রতিফলন। 'আরও চাই' এই উগ্র বাসনার অনুসরণ করে ব্যক্তি নিজেই সমাজের দাসত্ব এবং এভাবে অধিকার-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে, উদ্ভব হয় স্বৈরতন্ত্রী শাসকের। সমাজে এই এস্টাব্লিশমেন্টারীয়ানিজমের (establishmentarianism) জন্য ব্যক্তিমানুষ নিজেও কম দায়ী নয়। সমস্যাটিকে খুব গভীরে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনি বলেছিলেন "চালকলা-বাধা বিদ্যে শিখতে চাই না" "বাবু সাজতে পারবো না", তাই তিনি কাম-কাঞ্চনকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

বিদ্যার প্রতি তিনি অনাগ্রহী ছিলেন না—তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন, সুন্দর অভিনয় করতেন, নাটক রচনা করতে পারতেন, সঙ্গীতে ও প্রতিমা-নির্মাণে তাঁর দক্ষতা সুবিদিত। অর্থাৎ যে বিদ্যা নিত্যনতুন সৃজনশীলতায় উন্মুখ, তাকে তিনি আবাহন জানিয়েছিলেন সমগ্র সত্তা দিয়ে। কিন্তু বিদ্যা যেখানে এই সৃজনশীলতাকে পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্র বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধিতে নিয়োজিত তাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন। অতীতের পাদ্রী-পুরোহিত-মৌলবী, বর্তমানের বুদ্ধিজীবীরা স্বীয় স্বার্থে বিদ্যার অপব্যবহার করে সমাজের শাসক-এস্টাব্লিশমেন্টকেই মদত দিয়ে পুষ্ট করেন, বৈজ্ঞানিকেরা মারণাস্ত্র আবিষ্কারে মেতে ওঠেন, আইনজীবীরা জেনে শুনেও আদালতে সমাজ-বিরোধীদের সমর্থনে দাঁড়ান। অর্থ-পদ-সম্মান ইত্যাদির মোহে মানুষ বাবু সাজে, ব্লু-কলার শ্রমিকেরও লক্ষ্য হোয়াইট-কলার শ্রমিকে পরিণত হওয়া। বিদেশ-ভ্রমণ ও সরকারী পুরস্কার লাভের জন্য বুদ্ধিজীবীরা ভাড়াটে বুদ্ধি-জীবীতে পরিণত হতে দ্বিধাবোধ করেন না। এই 'বাবু' সাজার তাগিদেই মানুষ এস্টাব্লিশমেন্টকে মদত দেয়, নিজেও বদ্ধ হয়। আর 'কাঞ্চন' তো শুধু টাকা নয়, বিলাসদ্রব্যও। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ফলে আজকের সমাজে যে নিত্যনতুন বিলাসদ্রব্য তৈরী হচ্ছে তার use value কিংবা exchange value ততটা নয় যতটা want value—কামনার তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তি মানুষের কাছে কাঞ্চনের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। একটি শিশুর কাছে সোনার অলঙ্কারের কোনও দাম নেই, জ্ঞানতাপস অধ্যাপকের কাছে কোনও দাম নেই নাজিয়া হোসেনের গানের। ব্যক্তিমানুষের কামনাই যে কাঞ্চনের 'মূল্য' বৃদ্ধি করে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষকে বদ্ধ ও যান্ত্রিক করে তোলে এ-কথা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ কাম-কাঞ্চনকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তাঁর এই ধিক্কারকেই আজ পাশ্চাত্যের মানুষ নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করছে—সার্ত্রের নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখান, ইওরোপের হিপি আন্দোলন, আমেরিকায় ভিয়েৎনাম-যুদ্ধের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ, হাঙ্গেরী-পোলাণ্ড-চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণবিক্ষোভ, ফ্রান্সে ছাত্রবিক্ষোভ, রাশিয়ায় নতুন করে ধর্মানুরাগের বৃদ্ধি, এ-সবই তার নিদর্শন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে দুইবার কেঁদেছেন। সাধনজীবনের শুরুতে দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে বলেছেন : মা, আরেকটা দিন চলে গেল, দেখা দিলি না! সমস্ত সাধনার শেষেও তিনি আবার কেঁদেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের

কুঠিবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে কেঁদে বলতেন: ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়। ঈশ্বরের জন্ত ক্রন্দন পরিণত হয়েছিল মানুষের জন্ত ক্রন্দনে। এই আকুতিবশতই তিনি স্বীয় সহধর্মীনীকে বলেছিলেন, "লোকেরা অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে, তুমি ওদের একটু ছাখো।" প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ও সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরীমাকে এজন্তই তিনি বারবার বলেছেন লোকশিক্ষায় এগিয়ে যেতে, গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন: নাটক ছেড়ো না, ওতে লোকশিক্ষা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পুজো করেছেন, কিন্তু কার পুজো? ভবতারিণী-মন্দিরে দেবীমূর্তির পায়ের ফুল দিতে গিয়ে 'আত্মভোলা' হয়ে সেই ফুল নিজের মাথাতেই দিতেন, সমস্ত সাধনার শেষে তিনি সাধনার ফল যাঁর পায়ে অর্পণ করেছিলেন তিনিও একজন মানুষ, আর এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার কয়েক দিন আগে যে ফটোটিতে তিনি শেষবারের মতো পুষ্পাঞ্জলি দিলেন সেই ফটোটিও ছিল একজন মানুষের। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় এভাবে বারবার ফুটে উঠেছে মানুষের কথা। অহর্নিশি সমাধিস্থ অবস্থায় থেকেও তিনি মানুষের কথা ভুলে যাননি। কাশী যাবার পথে দেওঘরে নিরন্ন মানুষদের দেখে মথুরবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের খাদ্য-বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে। মথুরবাবু অর্থব্যয়ে একটু আপত্তি জানালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাগ করে বলেছিলেন, "দূর শালা, রইলো তোর কাশী; আমি এদের সাথেই থাকবো।" পূর্ববঙ্গে মথুরবাবুর সাথে বেড়াতে গিয়ে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা দেখে নিজেই আর্জি রেখেছিলেন: সেজোবাবু, তুমি ওদের খাজনা মাপ করে দাও, ওরা বড় গরীব। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মনোভাবের সাথে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের মনীষীদের মিল আছে। তাঁরাও বলেছিলেন—মানুষ উপায় নয়, উদ্দেশ্য। মানুষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁরা শুধু মানুষের অধিকারবোধের কথাই বলেছিলেন। আজও বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়। আর অতীতে ভারতের বিভিন্ন যুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি—যা ছিল তখনকার সামাজিক সংবিধান—বলেছে মানুষের মৌলিক দায়িত্বের কথা। উভয়ই আংশিক সত্যকে তুলে ধরেছে। মানুষ যেমন সমাজকে কিছু দেয়, তেমনি সমাজের কাছ থেকে কিছু নেয়ও। সমাজে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় যখন এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য (balance) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একদিকে বিভিন্ন ব্যাপারে

বিদ্রোহ করছেন, অন্যদিকে শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ ও গৃহভৃত্য লাটুকে পাশাপাশি বসিয়ে সাধনা শেখাচ্ছেন, নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশ ঘোষের মতো মা-সরদা ও গৌরীমাকে লোকশিক্ষা দিতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, তখন বোঝা যায় তাঁর সাম্যবাদ আদান-প্রদানের সামঞ্জস্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ; শুধু অধিকার (right) বা দায়িত্ব (duty) নয়, দুইয়ের মিলনেই যথার্থ সাম্যবাদ গড়ে ওঠে।

ইওরোপীয় রেনেসাঁস মানুষের উন্নতির পথে 'একক মানুষ' থেকে 'অনন্য মানুষে' পরিণত হওয়া এবং শেষে বিশ্বজনীন মানুষে রূপান্তরিত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি সামাজিক-ধর্মীয় জাতীয়-রাষ্ট্রীয়-শ্রেণীগত-ভাষাগত গোষ্ঠীচেতনায় বিলুপ্ত মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, যে-মানুষ 'কাঁচা আমি'কে ত্যাগ করে 'পাকা আমি'কে বরণ করে নেয়। কিন্তু সেখানেই থামেননি তিনি ; মানুষ তার ব্যক্তিত্বের বা সুপ্ত শক্তির সর্বতোমুখী বিকাশে যত্নবান হোক, এটাই ছিল তাঁর কাম্য। আর সেজন্যই নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য যিনি পড়াশোনায়, গানে, খেলায়, রান্নায়, তর্কে পারদর্শী। শিষ্যদের ধর্মীয় সাধনা শেখানোর সময় দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে এগিয়ে দিচ্ছেন জ্ঞানের পথে, রাখালকে ভক্তির পথে, কালীপ্রসাদকে যোগের পথে। অর্থাৎ, লক্ষ্য রেখেছেন যাতে সবাই নিজস্ব মৌলিক পথে সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের বলেছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ মৌলিক ছিলেন ; আমাদেরও প্রত্যেককে মৌলিক হতে হবে।" ইওরোপীয় রেনেসাঁসের মনীষীদের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে শুধু সৃষ্টিশীল প্রাণী হিসেবেই গণ্য করেননি, মানুষের মধ্যে যে বহুমুখী বিকাশের সম্ভাবনা বর্তমান তার ওপরও জোর দিয়েছেন।

মানুষ সম্বন্ধে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তাধারার অবশ্য দুটি পর্যায় আছে যা লক্ষ্য করা যায় তাদের সাহিত্যে। প্রথমযুগে সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর, যাদের গড়পড়তার ছাঁচে ফেলা যায় না, যারা আজীবন সংগ্রামী, হেরে গেলেও নতিস্বীকার করেনা। এদের চরিত্র নৈতিক হতে পারে, আবার অনৈতিকও, কিন্তু সবসময়ই এদের ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশিত। শেকস্পীয়ার, গ্যেটে, শেলি, স্তাঁদালের সাহিত্যে এরাই নায়ক-নায়িকা। বাংলার মঙ্গলকাব্য থেকে বঙ্কিম-মাইকেলের সাহিত্যে এ-ধরণের চরিত্রের

উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই চরিত্র-কল্পনার মধ্যে যে ত্রুটি আছে, এরা যে আদর্শ মানুষ হতে পারেনা এ কথা বুঝেছিলেন দ্বিতীয় যুগের সাহিত্যিকেরা। প্রথমযুগে নায়কের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলেও অন্যের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সে উদাসীন। তাছাড়া মানুষ যেমন সৃজনশীল জীব, তেমনি পরিবেশ ও সমাজেরও একটা ভূমিকা আছে যে-ভূমিকাকে অস্বীকার করলে ব্যক্তির সাথে বিশ্বের সংঘাত উপস্থিত হয়। এই দ্বিতীয় ধরণের সমস্যাটি বিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও ক্রমশই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে পরিবেশ-দূষণ, একনায়কতন্ত্র, পারিবারিক সংঘাত, সামাজিক সংঘর্ষ ইত্যাদি সমস্যায়। রেনেসাঁসের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই যে সব সাহিত্য রচিত হতে লাগলো তার নায়ক-নায়িকারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও অন্যের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল, সকলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও সে আত্মপ্রত্যয় হারায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র এই আদর্শের বিরোধী নয়। তাঁর বিদ্রোহী সত্তার কথা আগেই বলেছি। অল্পশিক্ষিত হয়েও তিনি যেভাবে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের সাথে নির্ভয়ে কথা বলেছেন তা তাঁর গভীর আত্মপ্রত্যয়ের প্রমাণ দেয়। আবার এইসাথেই দেখি যে তিনি গৃহভৃত্য লাটু, নটী বিনোদিনী, বৃন্দে ঝি, চিনু শাঁখারী, রসিক মেথরেরও আপনজন। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ তিনি যে শুধু নিজের জীবনেই ফুটিয়েছেন তা নয়, প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকেও ঐ পথ দেখিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতাবোধ

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিকে যেমন শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের সাথে মিশেছেন, অন্যদিকে সমাজে যারা নিন্দিত তাদের সাথেও মিশেছেন। এজন্য তাঁকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। ভিক্টোরীয়া-যুগের শুচিবাই ও ব্রাহ্ম নীতিবাদের যুগে যখন সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে অভিনেতারা মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র এবং অভিনেত্রীরা বারবনিতা, যখন কেশব সেন পত্রিকায় লিখছেন "বেশ্যার অভিনয় অবাধে প্রচলিত হইলে ভারতে আর একটি সর্বনাশের দ্বার খোলা হইবে" যখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় লিখছেন "আমরা তাঁহার (গিরিশচন্দ্র ঘোষের) কোনো নাটক পড়ি নাই, বাঙ্গালা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারেও কখন যাই নাই", শিবনাথ শাস্ত্রী দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করে মন্তব্য করছেন "যাব কি, থিয়েটারের হীনচরিত্র লোকের সঙ্গে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) সম্পর্ক, ওখানে আর আমাদের যাওয়া চলে না"

তখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা শ্রীরামকৃষ্ণের সহানুভূতি ও ভালবাসা পেয়েছেন অকাতরে। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই জগৎ শুধু মহাপুরুষ আর ঈশ্বরকোটি মানুষ দিয়ে তৈরী নয়, এখানে রয়েছে সাধারণ অতিসাধারণ মানুষ ও যারা সমাজে নিন্দিত উপেক্ষিত। পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি ভাল-মন্দ সবরকম লোককেই গ্রহণ করেছেন, তাদের সাথে মিশেছেন। তিনি জানতেন যে ইচ্ছে করে কেউ খারাপ হয় না ; শক্তির অভাবে, পরিবেশের প্রতিকূলতায় মানুষ অসহায়ভাবে খারাপ পথে এগিয়ে যায়, এবং তাকে ভাল করার উপায় গালাগালি দেওয়া বা উপেক্ষা করা নয়. প্রয়োজন হৃদয়ের ভালবাসা ও আন্তরিকতায় তাকে কাছে টেনে নেওয়া।

মানুষের দুর্বলতা আছে জেনে সেই দুর্বলতাকে মানুষের কাছে সহনীয় করে তুলতেন না তিনি, বরং বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন তার সুপ্ত শক্তির কথা। তাঁর বলা সিংহশাবকের গল্প আগেই বলেছি আমরা। যুবক হরিনাথ যখন আপন ব্যর্থতায় তাঁর কাছে অকপট স্বীকারোক্তি করেছিল, তিনি তখন তাকে বলেছিলেন, "তুমি বোঝ আর না বোঝা তুমিই রাম।" অর্থাৎ মানুষই স্বয়ং ঈশ্বর, অসীম শক্তির আধার, সে তা বুঝুক আর নাই বুঝুক। আরেকদিনের ঘটনা—তাঁরই এক গৃহী অনুরাগীর সন্তান মারা গেছে। শ্মশানে পুত্রকে দাহ করে ভদ্রলোক আর বাড়ি ফিরে যেতে পারেননি, ছুটে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে। পুত্রহারা পিতার শোকাশ্রু দেখেও তিনি স্থির। সমবেত ভক্তবৃন্দ ও অনুরাগীরা ভাবছেন, এ-সময়ে গুরুর উচিত ভক্তকে সান্ত্বনা দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ ভক্তকে দেখে তাল ঠুকে গান ধরলেন : জীব সাজ সমরে/দেখ রণবেশে কাল প্রবেশ তোর ঘরে। সান্ত্বনা নয়, মাথায় হাত বোলানো নয়, মিষ্টি কথা নয়, সহানুভূতি নয়, শিষ্যের সংকটমুহূর্তে তিনি তাকে আহ্বান জানালেন "সাজ সমরে"—উঠে দাঁড়াও, বিপদের মুখোমুখি হও। মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই, মানুষের শক্তি-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন রুখে দাঁড়াতে—'সবার ওপরে সত্য' এই বাণীর আচার্য ছিলেন বলেই মানুষকে সান্ত্বনা নয়, সাহস দেবার চেষ্টা করেছেন সবসময়। প্রকৃত মানবতাবাদ শুধু নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকে না, অন্যের শক্তি সম্বন্ধেও সচেতন থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতাবাদ গভীর ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শনেরই ফসল।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মানুষ বিবেকানন্দ

একটি প্রশ্ন

আকাশ ও পৃথিবীর নিজস্ব রূপ ছাড়াও অন্য রূপ আছে। সেই রূপ মানুষের মনে। দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে যে-রূপ শিল্পীর কাছে ধরা পড়ে, কবির চোখে তা নগণ্য নয়; বরং তা অপরূপ করে তোলে ঐ আকাশ আর পৃথিবীকে। প্রতিভাবান মানুষ সম্পর্কেও একই কথা। দেশ ও কালের পরিবর্তনে তাঁদের মূল্যায়ন আর পুনর্মূল্যায়ন তাঁদের সীমাহীন ব্যক্তিত্বের নানান দিককে তুলে ধরে। এঁদের মূল সত্তার অন্বেষণে নতুন বিচার-শৈলী, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন উত্তর পুরুষদের নিজস্ব প্রয়োজন। এ প্রয়োজন ইতিহাসেরও যেহেতু এঁদের আবির্ভাব শুধু ঘটনা নয়, একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়।

নরেন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ, এই উত্তরণ-পর্ব নিয়ে আলোচনা নতুন কিছু নয়। ভগিনী নিবেদিতা থেকে শুরু করে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্রিস্টোফার ঈশারউড থেকে শংকরীপ্রসাদ বসু, অনেকেই এ নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সে-সব গবেষণায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব, ভারত প্রব্রজ্যার অভিজ্ঞতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব ইত্যাদি নানান কারণে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দে পরিণত হয়েছিলেন, এ কথা আমরা পাই পূর্ব-গবেষকদের লেখায়। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। উপরোক্ত প্রভাবগুলিই কি চূড়ান্ত ছিল? অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব তৎকালীন বহু ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক এবং নব-যুবকদের ওপরেও পড়েছিল; এ-প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বহু লেখক, অভিনেতা, সমাজ-সংস্কারকও। এ-সত্ত্বেও 'বিবেকানন্দ' হতে পেরেছিলেন একজনই। কিংবা ভারত-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা অগাধ পাণ্ডিত্য বা সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার সাথে পরিচয়, এ সবে তৎকালীন যুগে স্বামীজীর একচেটিয়া অধিকার তো ছিল না! বরং ভারতীয় নবজাগরণের সেই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে উপরোক্ত গুণ অনেকেরই ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও সেই যুগে স্বামীজী যেভাবে দু'হাতে ধরে ভারতের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনটি অন্য কারোর মধ্যে দেখা যায়নি। অতএব বলতেই হবে যে আরও কিছু উপাদান ছিল যা নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে পরিণত করেছিল। পূর্ব গবেষকদে

প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলা যায়, এই রূপান্তর সাধনে নানান প্রভাবকে আবিষ্কার করার চেয়ে বড় কাজ মানুষ বিবেকানন্দকে খুঁজে বের করা। আলো-হাওয়া-জল থাকলেই বিশাল মহীরুহের সৃষ্টি হয় না, তার জন্য দরকার সঠিক বীজ যার মধ্যে লুকিয়ে আছে মহীরুহের প্রাণবন্ত সম্ভাবনা। স্বামীজীকে আবিষ্কার করতে গিয়ে এই মৌল সত্যটিকে ভুললে চলবে না। তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা পূর্বোল্লিখিত প্রভাবগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাড়া দিয়েছিল মৌলিক চিন্তার সাহায্যে। আর, এইটিকেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি 'মানুষ বিবেকানন্দ' রূপে।

প্রত্যক্ষ-যুক্তি-সত্য

তরুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করি তা হল সত্যানুসন্ধিৎসা। ইতিহাস থেকে গণিত, সাহিত্য থেকে দর্শন, বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পড়াশোনা তাঁর ছিল ঠিকই, কিন্তু নিছক পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি এতে উদ্যোগী হননি। এনট্রান্সে প্রথম বিভাগে পাশ করলেও এফ-এ এবং বি-এ পরীক্ষায় তিনি এতো ভাল ফল দেখাতে পারেন নি। তাঁর মতো একজন ছাত্র যাঁকে কলেজের প্রিন্সিপাল উইলিয়াম হেস্টি জার্মান-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শনের ছাত্রদের চেয়েও বুদ্ধিমান বলে অভিহিত করেছিলেন, দার্শনিক স্পেন্সার যাঁর যুক্তিবত্তায় মুগ্ধ হয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে অনায়াসেই উচ্চস্থান অধিকার করতে পারেন নি কেন? তার কারণ, নরেন্দ্রনাথ তখন মৌল সত্যের সন্ধানে অধীর। বইয়ের মধ্যে সেই সত্যের সন্ধানই তিনি করতেন ; কিছু না পেলে বইগুলি তাঁর মনে কোনও গভীর ছাপ রাখত না।

তিনি তখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন জগৎ ও জীবন রহস্যের মৌল সত্যকে। এমন একটি মৌল সত্য যা যুক্তিসিদ্ধ। হিউমের সংশয়বাদ, স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ, মিলের 'থ্রী এসেজ অন রিলিজিয়ন' তাঁর প্রশ্নকে শুধু তীক্ষ্ণই করে তোলেনি, বৌদ্ধিক অনুমানে তাঁকে করে তুলেছিল সাহসী। ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি একটা আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন, কিন্তু ধর্মকে তিনি দেখতে চাইতেন যুক্তিসিদ্ধ বিচারের কষ্টিপাথরে। ফলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। ব্রাহ্মসমাজ তাই তাঁকে টেনেছিল। রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্রের তাত্ত্বিক ধর্মালোচনা তাঁর কাছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে

বড় মনে হয়েছিল। এ সত্ত্বেও কিন্তু তিনি চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি, কারণ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাত্ত্বিক ধর্মালোচনা হয় নৈতিক চরিত্র ও ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে, নয়তো অজ্ঞেয়বাদে পর্যবসিত হচ্ছে। অথচ তাঁর বক্তব্য ছিল, মৌল সত্যের অস্তিত্ব যদি বাস্তব-ই হয় তবে তা প্রত্যক্ষের বিষয় হবে না কেন? যেমনভাবে এই কাঠ-পাথর-বাড়ি দেখছি, ঠিক সেভাবে মৌল সত্যকে দেখা যাবে না কেন?

জীবনের এই সংকট-মুহূর্তে তাঁর দেখা হল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। আত্মভোলা এই সরল মানুষটির মধ্যে তিনি বহুবিধ গুণ দেখতে পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে সবচেয়ে অবাক করল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য? মৌল সত্যের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ এতদিন যুক্তি-অনুমানের ওপর নির্ভর করছিলেন, কিন্তু এই সহজ সরল পূজারী কথা বলেছেন প্রত্যক্ষের ওপর দাঁড়িয়ে। এতদিন নরেন্দ্রনাথ সকলকে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াচ্ছিলেন, আর আজ তিনি নিজেই এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। 'ঈশ্বরকে আমি দেখেছি এবং যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বলিষ্ঠ ঘোষণা তাঁর চিন্তাজগতে বিরাট আলোড়ন এনে দিল। কি সেই আলোড়ন? তিনি বুঝলেন, অ্যাবস্ট্রাক্ট্ বলে কিছু নেই, যা সত্য তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, যুক্তিসিদ্ধ অনুমান-ই শেষ কথা নয়, যা যুক্তিসিদ্ধ তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়ও।

চিন্তার জগতে যে নতুন অস্ত্র লাভ করলেন, নরেন্দ্রনাথ তা প্রথমেই প্রয়োগ করলেন তাঁর শিক্ষাদাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ওপর। ত্যাগ, পবিত্রতা, সততা, সরলতার প্রতিটি দাবীকে তিনি যুক্তিবিচারে নয়, পরীক্ষা করলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে। তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণে বারবার তিনি পরীক্ষা করলেন, আর প্রতিবারই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্র শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর রূপে প্রতিভাত হল। এবারে নিজের পালা। সত্যকে তিনি নিজে উপলব্ধি করবেন, তবেই বিশ্বাস করবেন। ধ্যানের গভীর মুহূর্তে নির্বিকল্প সমাধিতে তিনি লাভ করলেন সেই চরম সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

সত্য কি, এই চিন্তায়ই তাঁর যাত্রা শুরু। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে উত্তর খুঁজেছেন মনীষীদের চিন্তার মধ্যে কিছুটা আভাস পেয়েছেন, যুক্তি-বিচার তাঁকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল। পরে বুঝলেন, যুক্তির চেয়েও বড় প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের দাবীদারকে তিনি পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষায় নিঃসন্দেহ হয়ে

এগিয়ে গেছেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির প্রচেষ্টায়। এতে সাফল্যলাভ করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে বলতে পেরেছিলেন, ধর্মকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা যায় এবং করা উচিত! লক্ষ্যণীয়, নরেন্দ্রনাথ এই মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর জীবনেরও ঘাত-প্রতিঘাত। আর পাঁচজন মানুষের মতোই তাঁর চিন্তা ক্রমবিকশিত হয়েছিল, যেটুকু তফাৎ তা হল আর পাঁচজন মানুষ থেকে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা এ-ব্যাপারে বেশি ছিল।

সংগ্রামী চেতনার ক্রমবিকাশ

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মতবাদ যদি একটু ভাল করে লক্ষ্য করা যায়, স্পষ্টতই কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অদ্বৈত-বেদান্তের অনুসারী হয়েও 'মায়া' বা মিথ্যার অন্য সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন যা ঠিক শংকরাচার্যের অনুসারী নয়। ঔপনিষদিক দর্শনকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েও তিনি বলেছেন : আধুনিক যুগে বেদান্ত দর্শন ও রাজযোগই প্রধান পথ হবে। ধর্মীয় পুরুষ হয়েও তিনি মধুসূদনের রাবণ-চরিত্র এবং মিলটনের শয়তান-চরিত্রে মুগ্ধ।

অনেকে মন্তব্য করেছেন, ধর্মীয় শক্তিবাদকে স্বামীজী জাতীয় জীবনের জাগরণে লাগাতে চেয়েছেন এবং এর ফলেই সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এ জন্যই তিনি পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্মের কথা বলে বিশ্ব-মানচিত্রে ভারতকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন। এসব মন্তব্যে যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করার প্রয়াস এতে অল্প। আসলে, স্বামীজীর জীবন, কর্ম ও বাণীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনবোধ। একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে জীবন গড়ে তুলে পূর্ব-পরিকল্পিত প্রচারকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেননি। তাঁর মানসিক সত্তার মধ্যে ছিল একটি মৌল-প্রত্যয়। এবং এই মৌল প্রত্যয়টিই তাঁর জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কি সেই মৌল প্রত্যয়টি? একটি সংগ্রামী চেতনা, একটি বিদ্রোহী ভাব জুড়ে ছিল তাঁর সত্তাকে। তাঁর জীবনের মধ্যে দেখি, সেই সংগ্রামী চেতনাটিই ক্রমবিকশিত হয়েছে।

এই যে সংগ্রামী চেতনা, এর ফলেই তিনি প্রথম জীবনে জানতে চেয়েছিলেন সুনির্দিষ্ট বিশ্ববিধান বলে কিছু আছে কিনা। সামাজিক বিধানের প্রতি তাঁর যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না তা দেখতে পাই 'মুসলমানের হুঁকোতে তামাক খেলে

জাত যায় কিনা' পরীক্ষায়, মা-বাবা ও গুরুজনদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক করায়, তাঁর চালচলনে এবং ধর্মীয় আচারের প্রতি বিমুখ মনোভাব। সুনির্দিষ্ট বিশ্ববিধান বলে কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে তিনি সরাসরি কোন মন্তব্য করেননি, বরং বলেছেন যে স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিতর্ক চলতে পারে। তাঁর নিজস্ব ঝোঁক কিন্তু ছিল স্বাধীন ইচ্ছার দিকেই। 'কৃপা' শব্দটিকেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মত ব্যাখ্যা করেছেন আশীর্বাদ হিসাবেই। নির্বিকল্প সমাধিতে যে উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল, তা তার সংগ্রামী চেতনারই পরিণতি বা পরিপূরক। 'আমার শক্তি অসীম' এই থেকেই সংগ্রামী চেতনার জন্ম। নির্বিকল্প সমাধিতে তিনি এই জীবনবোধেরই যথার্থতা উপলব্ধি করলেন। এই বোধই গড়ে তুলল তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এর ফলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অদ্বৈত বেদান্তের পথিক।

আত্মবিশ্বাস ও মানবতাবাদ

কিন্তু মানুষের জীবন তো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। দুঃখ, হতাশা, ব্যর্থতা, পরমাত্মীয়ের মৃত্যু—এসবকে তো কেউ এড়াতে পারে না! মানুষের সংগ্রামও হার মানে বহু সময়। অনেকে এখানে সান্ত্বনা খোঁজেন! কেউবা বলেন এ ভবিতব্য। স্বামীজী কিন্তু সান্ত্বনায় বিশ্বাসী নন। সংগ্রামী চেতনার ফলে যে আত্মবিশ্বাস লাভ করেছেন, তা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে অন্য মানুষের শক্তিতেও আস্থাশীল হতে। এর ফলে তিনি চেয়েছেন সব মানুষই সংগ্রামী হোক। আত্মবিশ্বাস তাঁকে করেছে মানবতাবাদী। এই মানবতাবাদ মানুষের অসীম শক্তিতে বিশ্বাসী, মানুষকে মাথানত করতে দেখলেই মনে করে তারই মাথা নত। আবার সান্ত্বনা মানে তো একধরণের মাথা নত করাই। স্বামীজী তাই ব্যর্থতায় বা দুঃখে সান্ত্বনা চাননি। বরং তাঁর আদর্শ, মানুষ মাথা উঁচু করেই এগুলির মুখোমুখি হোক। আনন্দ ও সাফল্যের মতো দুঃখ ও ব্যর্থতাও জীবনের পথে সত্য। তাই সত্যকে এড়িয়ে যেতে তিনি চাইলেন না, একেও তিনি গ্রহণ করলেন বুক পেতে। এজন্যই দেখি তিনি মা কালীকে শুধু দয়াময়ী বলেই গ্রহণ করলেন না, মৃত্যুরূপা রূপেও দেখতে চাইলেন তাঁকে। এ কারণেই তিনি দ্বৈত ও বৈশিষ্ট্যৈদ্বৈতবাদীর 'অশেষ-কল্যাণগুণাশ্রয়, ঈশ্বরের পরিবর্তে ঝুঁকলেন অদ্বৈতবেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মের দিকে। আর একই চেতনার ফলে তিনি 'মায়া' শব্দের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। "অতস্মিন্ তদবুদ্ধি' ব্যাখ্যার মধ্যে যে একটি প্রচ্ছন্ন সান্ত্বনার প্রলেপ আছে

তা তার চোখ এড়ালো না। বললেন—Maya is the statement of facts, জগতে আনন্দ-দুঃখ আশা-নিরাশা সাফল্য-ব্যর্থতা পাশাপাশি থাকে এটি জেনেও কেবল আনন্দ-আশা-সাফল্য কামনা করাটাই অজ্ঞানতা, অবিদ্যা বা মায়া। Failure is the piller of success—এই মতবাদেও রয়েছে সান্ত্বনা। স্বামীজী তাই এ সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নন, তার মতে (Failure is the beauty of life.) ব্যর্থতা তার চোখে জীবনের সৌন্দর্য কেন ? কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন যে উদ্যোগীর জীবনেই ব্যর্থতা আসে, যে অলস, কর্মভীরু সে তো কাজই করে না, ফলে তার জীবনে ব্যর্থতাও কম। কিন্তু একজন কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এতে স্বামীজী দুঃখিত নন, তিনি বুঝতে পেরেছেন সীমিত শক্তি নিয়ে সে বড় কিছুকে পেতে চেয়েছে। সে ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংগ্রামী চেতনার পরিচয় যে দিয়েছে তাতেই স্বামীজী আনন্দিত। মানবাত্মা মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে শত বিঘ্নের মধ্যেও—স্বামীজীর কাছে এটি শ্রেষ্ঠ শিল্প। সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রতিটি মানুষের জীবনের সাথেই জড়িয়ে থাকে বলে স্বামীজী তা নিয়ে মাথা ঘামাননি, তিনি দেখতে চেয়েছেন সংগ্রাম। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ-চরিত্র তাই তার চোখে সুন্দর। বীর-ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ সহ লঙ্কার সব বীরযোদ্ধাই যুদ্ধে নিহত, রাণী মন্দোদরী এসে রাবণকে মানা করছে এই ব্যর্থ যুদ্ধে যেতে ; তবুও রাবণ যুদ্ধে পরাংমুখ নয়, নিশ্চিত পরাজয় জেনেও সে যুদ্ধে অগ্রসর হতে চাইছে—এই দৃশ্য স্বামীজীর চোখে মহান। সহস্র দুঃখ বিপদের মধ্যেও মানবাত্মা তার সংগ্রামী চেতনার পরিচয় দিচ্ছে, এ-দৃশ্যে স্বামীজী উৎফুল্ল। প্যারাডাইস লষ্টের সেই পংক্তিগুলি তাঁর কাছে প্রিয় ("What though the field be lost ? / All is not lost ; the unconquerable will /...And courage never to submit or yield"। নচিকেতা ও সাবিত্রী চরিত্র তাঁর কাছে প্রিয়, কারণ মৃত্যুদেবতার মুখোমুখি তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সামান্য মানুষ হয়েও।

এই সংগ্রামী চেতনা বা জীবনবোধ থেকেই গড়ে উঠেছে স্বামীজীর জীবন-দর্শন। তাঁর বেদান্তপ্রীতি, তাঁর মানবতাবাদ, এই জীবনবোধেই সৃষ্টি। এই বোধ থেকেই সাহিত্যে তিনি নবদিগন্ত দেখিয়ে যেতে পেরেছেন। সামাজিক বিধান মেনে তিনি সাহিত্যে গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। বাংলা ভাষাকে তিনি ভেঙে নতুন করে গড়ে দিয়ে দিয়ে গেলেন। প্রাচ্য ও

পাশ্চাত্য এবং 'পরিব্রাজক' বই দুটিতে তার নজির মিলবে। আর শিল্পের জগতে নিখুঁত প্রোপোরশন্ নিয়েও গ্রীকশিল্প ও মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য শিল্প স্বামীজীর কাছে প্রশংসাধন্য হতে পারেনি। তাঁর কাছে ভারতের বৌদ্ধশিল্প আর লোকশিল্প রসোত্তীর্ণ। এর মূলে কিন্তু তার জনপ্রিয়তাবাদ বা স্বদেশ-প্রেম দায়ী নয়। মূলে রয়েছে তার জীবনবোধ বা মানবতাবাদ। গ্রীক ও পাশ্চাত্য শিল্পীরা মানুষ হয়ে প্রকৃতিকে অনুকরণ করতে গিয়েছিলেন বলেই স্বামীজী তাদের প্রতি বিমুখ। তিনি চেয়েছিলেন তার সৃষ্টিতে স্বীয় চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলুক। মানুষ মনের মধ্যে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই ভাব শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই স্বামীজীর চোখে তা সুন্দর। বৌদ্ধশিল্প তাই তার কাছে অপরূপ। মানুষের প্রতি ভালবাসাই তাকে লোকশিল্পের পূজারী করেছিল। অতি সাধারণ মানুষ তার হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খা দুঃখ-আনন্দ ফুটিয়ে তোলে যে শিল্পে, সেই লোকশিল্প স্বামীজীর আদরের ধন, কারণ এতে ফুটে ওঠে প্রাণের ভাষা, হৃদয়ের অভিব্যক্তি। লক্ষ্যণীয় এই যে অ্যাকাডেমিক চর্চা স্বামীজীর শিল্পদৃষ্টির স্রষ্টা নব, এর স্রষ্টা তার জীবনবোধ বা মানবতাবাদ। এই জীবনবোধই তাকে প্রবৃত্ত করেছিল রাষ্ট্রনীতির নবদিগন্ত সন্ধানে। আত্ম-বিশ্বাস তাকে এনে দিয়েছিল অন্য মানুষের ওপর বিশ্বাস। আর এজন্যই রাজনীতিতে সু-শাসনের চেয়ে স্ব-শাসনের ওপর নজর দিলেন তিনি। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি চাইলেন না এথিওক্রেটিক ষ্টেট; রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অশোক বা আকবরের রাজত্বও তার কাছে কাম্য নয়। কেন? কারণ তিনি লক্ষ্য করেছেন: 'দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজা কখনও স্বায়ত্ত-শাসন শিখে না'। এমন এক রাষ্ট্র-চাইলেন তিনি যেখানে নেতারা নয়, প্রজারাই প্রধান। জনগণ তাদের নিজেদের উন্নতির পরিকল্পনা নিজেই করবে, আর সেই সাথে শিখবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একত্র হয়ে কিভাবে প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।

আধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ

আগেই বলা হয়েছে, কোনও দর্শন অনুসারে স্বামীজীর জীবনবোধ গড়ে ওঠেনি, বরং তার জীবনবোধই গড়ে তুলেছে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এবং একই জীবনবোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে সামাজিক সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করতে। নিবেদিতা বলেছিলেন, স্বামীজীর কাছে ধর্মীয় ও

জাগতিক ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও ভেদ ছিল না। কেন ছিল না? উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবো, অ্যাবষ্ট্রাক্ট কোন বস্তুর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল না তার জীবনবোধ। জাগতিক বস্তুনিচয়কে চোখের সামনে রেখেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এই বস্তুনিচয়কে বিশ্লেষণ করেই তিনি বুঝেছিলেন, এগুলির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা নিজে অদৃশ্য থাকলেও বস্তুর ব্যবহারের মধ্যে স্বীয় উপস্থিতিকে প্রকাশ করে তোলে। মানুষকে বিচার করতে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন, এবং এই এমন-কিছু'র নামই দিয়েছিলেন 'ঈশ্বর'। স্বামীজীর এই ঈশ্বর-তত্ত্ব কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় মহাপুরুষ বা শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যাত 'ঈশ্বর' থেকে ভিন্ন। স্বামীজী ব্যাখ্যাত এই 'ঈশ্বর' একটি টেক্‌নিকাল টার্ম। মানুষের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে যা বিভিন্ন বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে সংগ্রাম করে নিজেকে প্রকাশিত করছে। এবং এই সংগ্রামী চেতনাই যেহেতু মানুষের উন্নতি বা অবনতি নির্দেশ করছে, স্বামীজী তাই একেই মানুষের মূল সত্তা বলে অভিহিত করলেন। এই যে মূল সত্তার প্রকাশোন্মুখ প্রচেষ্টা যা সংগ্রামী চেতনার মধ্যে পরিস্ফুট, সেই চেতনা বিভিন্নভাবে বিভিন্নক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এই চেতনা কখনও ভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কখনও প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে সংগ্রাম করে, কখনও জাগতিক কোনও বস্তুকে স্বীয় ভাব অনুসারী রূপ দেবার চেষ্টা করে। এইসব প্রচেষ্টার নাম যথাক্রমে ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা। এদিকে লক্ষ্য রেখেই স্বামীজী মন্তব্য করেছিলেন: চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করার বিভিন্ন উপায় কি সেই সত্য? মানুষের মূল সত্তা এই তিনটি বিভাগেই, এই মূল সত্তা আত্মপ্রকাশ করছে সংগ্রামী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

এই ঈশ্বরও তার কাছে অ্যাব্‌ষ্ট্রাকট কোনও সত্তা নয়। এই ঈশ্বর প্রসঙ্গে স্বর্গ-নরক ইত্যাদি ধারণাও তিনি অযৌক্তিক মনে করলেন। তার একটি সাহসী উক্তি: জড়বাদীরা যাকে জড় বলে আমি তাকেই ঈশ্বর বলি। স্বামীজী যখন মানুষের মূল সত্তাকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করলেন তখন তার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জড়বাদী দর্শনে 'জড়', একটি মৌল প্রত্যয় (Prime Category) এবং এই প্রত্যয়টিই বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। চেতনা যখন জড়েরই একটি রূপ বা ম্যানিফেস্টেশন্‌ তখন স্বীকার করতেই হবে যে আত্মপ্রকাশের আগে চেতনা জড়ের মধ্যে সুপ্তাকারে ছিল।

শূন্য থেকে কোনকিছুর সৃষ্টি যেহেতু জড়ের মধ্যে চেতনার সম্ভাব্যতা (Potentiality) স্বীকার করতেই হয়। ফলে এই চেতনাকে বাদ দিয়ে জড়ের মৌল প্রত্যয় হিসেবে পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। স্বামীজী দেখলেন যে এই পয়েন্টে জড়বাদী দর্শন জড়ের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা খুঁজে পায়নি অথচ জড়কে মৌল প্রত্যয় বলে অভিহিত করতে গিয়ে এই সত্যকে তারা বাদও দেয়নি। তাই মৌল প্রত্যয় হিসেবে জড়ের যে তাত্ত্বিক রূপ তার সঙ্গে স্বামীজীর ঈশ্বর ধারণার তফাৎ নেই।

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মৌল প্রত্যয়টি নিজেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করেছে ও করছে। মৌল প্রত্যয় হিসেবে এটির পক্ষে একাধিক হওয়া সম্ভব নয়। স্বামীজীর ঈশ্বরও তাই অদ্বৈত হয়েও বহুরূপে প্রকাশিত। এবং এই ঈশ্বরের সন্ধানে পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দরকার নেই, যেহেতু প্রতিটি মানুষ ও জীবজন্তুর মূল সত্তারূপে এই ঈশ্বর অধিষ্ঠিত যার আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রাণীর সংগ্রামী চেতনার মধ্যে। স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন : মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হতে খুশিমতো সৃষ্টিকারী, মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শেখায় যে ঈশ্বর, প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী ঈশ্বর সর্বরূপে, সর্বভূতে। কোন দর্শনকে অনুসরণ করে তিনি সিদ্ধান্তে আসেননি, এসেছেন জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে যৌক্তিক সোপানের সাহায্যে। বস্তুত, জড়বাদী মানসিকতাকে আশ্রয় করেও যে বেদান্তোক্ত সিদ্ধান্তে যাত্রা শেষ হয়—স্বামীজীর আবির্ভাব না হলে এটি বুঝতে পারা যেত না।

মানসিক দ্বন্দ্ব

এবারে আর একটি মৌল প্রশ্নে আসা যাক। স্বামীজী স্বীয় জীবনে কি কোন মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছিলেন? বাহ্যজীবনে স্টার্ডি ও মুলারের মতো শিষ্যের বিরোধিতা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে দু-একজন গুরুভাইয়ের আপত্তি, এ-ধরণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁকে স্পষ্টই পীড়িত করেছিল। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধটি তাঁর অন্তরলোক নিয়ে। স্বামীজীর মানসলোকে উপরোক্ত ঘটনাগুলি অন্তত সাময়িকভাবে হলেও গভীর ছাপ ফেলেছিল। বাইরের ঘটনাগুলিই এখানে প্রধান। কিন্তু স্বামীজীর ব্যক্তিমানসে কোন বৈপরীত্য তিনি নিজে কি কখনও অনুভব করেছিলেন? এবং তা কি তাঁকে দ্বন্দ্ব বা যন্ত্রনার কষ্ট দিয়েছিল?

প্রাক-সন্ন্যাস জীবনে ও পরিব্রাজক অবস্থায় একটি দ্বন্দ্ব স্পষ্টই তাকে আলোড়িত করেছিল। মানসিক দিক দিয়ে নির্জন তপস্যাই ছিল তার পরম কাম্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাকে বারবার লোককল্যাণকর কাজকর্মে উদ্বুদ্ধ করতেন। পিতার মৃত্যুর পর চরম দারিদ্র্য তাকে জগতের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সচেতন করবে বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভেবেছিলেন. কিন্তু স্বামীজীর অন্তর-লোকের মূল ধারাটি রয়ে গেল আগের মতোই। এমনকি শেষ পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন রীতিমতো আদেশ করলেন, 'নরেন লোকশিক্ষা দিবে' তখন স্বামীজী প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। সমস্যা দেখা দিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর। স্বামীজী ভাবলেন, এবারে লোকশিক্ষার জন্য পীড়াপিড়ি করার কেউ নেই, অতএব নির্জন তপস্যায় তিনি ডুবে যেতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। যতবারই তিনি লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করতে চান, কোন-না কোন জাগতিক ঘটনা তাকে লোকালয়ে ফিরতে বাধ্য করে। তিনি বারবার চেষ্টা করেছেন পাহাড়ের গুহায় সবার অগোচরে তপস্যা করতে, আত্মপরিচয় গোপন করে ছদ্মনাম নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ইংরেজী জানেন না এই ভান করে অনেক সময় লোকজনের ভীড় এড়াতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। তার বিস্ময়কর প্রতিভাকে জনসাধারণ আবিষ্কার করে তার নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এই আক্ষেপ তাঁর সারাজীবন ছিল। শেষ জীবনে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—মুণ্ডিত মস্তক, ভিক্ষাপাত্র, গাছের নীচে বাস, আর নির্জন তপস্যা, এর জন্যই তিনি আজীবন ব্যাকুল, অথচ তা আর তার জীবনে এলোনা।

কেন এই ব্যাপারটি ঘটেছিল তার একটি সহজ ব্যাখ্যা আমরা পূর্বসূরী গবেষকদের কাছ থেকে পেয়েছি। তা হল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিদেহী আত্মা বা ঈশ্বর স্বয়ং স্বামীজীকে লোককল্যাণে প্রবৃত্ত করেছিলেন। ব্যাখ্যাটির মধ্যে যুক্তি আছে, এবং স্বামীজীর উক্তিতেও তার সমর্থন পাই। তিনি বলেছিলেন, যতবারই তিনি নির্জন গুহায় বসে তপস্যা করতে উদ্যোগী হন ততবারই কি একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে জোর করে লোকালয়ে টেনে আনে। পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে এই প্রবন্ধে আমরা আধ্যাত্মিক বা দৈব কোন যুক্তির বদলে জাগতিক ব্যাখ্যা দিতেই আগ্রহী, কারণ আমাদের লক্ষ্য 'মানুষ বিবেকানন্দ'কে আবিষ্কার করা।

স্বামীজী তপস্যা করতে চেয়েও বারবার লোকালয়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তার মানসিকতার জন্যই। পারিবারিক দারিদ্র্য তাকে বিচলিত করলেও মূল লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু পরিব্রাজক অবস্থায় সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। মানুষ হয়েও তারা পশুর অধম জীবন যাপন করছে, এই দৃশ্য তাঁর সংগ্রামী চেতনাকে প্রবল-ভাবে নাড়া দিল। যতবার তিনি ধ্যানে বসছেন, এই সাধারণ অসহায় মুখ-গুলি বারবার তাঁর সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। একদিকে নির্জন তপস্যার আকর্ষণ, অন্যদিকে দুঃখী মানুষের করুণ মুখচ্ছবি স্বামীজীকে সারাজীবন তাড়না করে ফিরেছে। তার মানস জীবনের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল এটাই। তার মনের যে মৌল চরিত্র বিদ্রোহী ভাব, সেটি তাকে টেনে আনল মানুষের মধ্যে। এই ভাবের বশতই তিনি মানুষকে আহ্বান করেছিলেন এই দুঃখ-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

মানুষকে সংগ্রামী করে তুলতে স্বামীজীকে কাজ করতে হয়েছিল। ফলে তার মধ্যে দুটি সত্তার যেন প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্ব উপস্থিত। (এ ধরণের দ্বন্দ্ব নেতাজীর মনেও দেখা দিয়েছিল। একদিকে সন্ন্যাস-জীবন, অন্যদিকে দেশের দুঃখ-দুর্দশা, তার মনে বিপরীত স্রোতের মতো উঠেছে, তাকে কষ্ট দিয়েছে।) এই দ্বন্দ্বের সমাধান তিনি করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের সাহায্যে। ভক্তমণ্ডলীর কাছে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গিয়েছিলেন এক মহামন্ত্র—শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। এই মন্ত্রকেই স্বামীজী ব্যবহারিক করে তুললেন স্বীয় প্রতিভাবলে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরেকদিন বলেছিলেন—মাটির প্রতিমায় ঈশ্বরের পুজো হয়, আর রক্ত-মাংসের শরীরে হয়না! তাঁরই বিখ্যাত উক্তি—চোখ বন্ধ করলেই ভগবান আছেন, আর চোখ খুললে তিনি নেই? স্বকীয় মৌল চেতনায় জাগরণে একজন গ্রামীণ মানুষ যে চিন্তার খোরাক দিয়ে গিয়েছিলেন, স্বামীজী তার মধ্যেই দেখতে পেলেন এক নতুন ধর্মান্দোলনের সূত্র। ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবন আলাদা নয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মন্দির ছাড়িয়েও গ্রামে-গঞ্জে মানুষের মাঝে—এ-কথা বুঝতে পেরে তিনি কর্মযোগকে তুলে ধরলেন নতুন আলোকে। এবং এভাবেই একটি বিরাট দ্বন্দ্বের সমাধান করলেন। বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানদের কাছে পরোপকারের উৎস করুণা। আর স্বামীজীর কাছে এর উৎস উপাসনা। আধুনিক পৃথিবীতে তাঁর এই বিরাট অবদানের তাৎপর্য সুগভীর।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, আদর্শ ও সমাজের মধ্যে তিনি কোন রকম 'কমপ্রোমাইজ' করেন নি। অধিকাংশ মনীষীর ক্ষেত্রে যেটি অনেক দ্বন্দ্ব নিয়ে আসে, স্বামীজীর ক্ষেত্রে তা কোনরকম সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। নিজের সম্বন্ধে একবার তিনি লিখেছিলেন : সব ব্যাপারেই আমি চরমপন্থী। আর মার্কিন চিত্রশিল্পী মড্ স্টাম্ স্বামীজীর হাঁটাচলার ভঙ্গী বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন : প্রতি পদক্ষেপে অবজ্ঞায় প্রত্যাখাত হয় পৃথিবী। কয়েকটি ঘটনা তার এই বেপরোয়া মনোভাব প্রকাশ করেছে সুন্দরভাবে। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি যখন মাদ্রাজে স্থানীয় একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলেন, সে-সময় হঠাৎ সেখানে তার দেখা হয় কলেজ-সহপাঠী এক বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুটি তাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন। মাদ্রাজী অনুরাগীরা যখন চলে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করল, তিনি উত্তর দিলেন—বহুদিন মাছ খেতে পাচ্ছিনা, ঐ বাড়িতে গেলে মাছ খাওয়া যাবে। আবার পাশ্চাত্য-যাত্রার সময় বোম্বাই জাহাজ ঘাটিতে বহু লোক যখন স্বামীজীকে বিদায় দিতে এসেছে, তিনি তখন একটা চুরুট খেতে খেতে পায়চারী করছেন। ঘটনা দুটি হয়তো সামান্য, কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, গত শতাব্দীতে গোঁড়া হিন্দুদের জায়গা মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে সন্ন্যাসীর মাছ ও চুরুট খাওয়া নিয়ে লোকেরা কি ভাববে তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাননি। মানুষ-বিবেকানন্দের মানসিকতার একটি উজ্জ্বল দিক এটি। এবং এটির ফলেই তিনি সাধারণ মানসিক দ্বন্দ্বগুলির ওপরে উঠতে পেরেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ একটি নেতৃত্বের বিশ্লেষণ
স্বামী সারদানন্দ

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পেছনে যদিও স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সবচেয়ে বেশি এবং সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের ভার বহুকাল স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওপর ছিল, তবুও স্বামী সারদানন্দকে বাদ দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আদি পর্বের কথা চিন্তা করা যায়না। দীর্ঘকাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, এর প্রশাসনিক ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়ে তিনিই রামকৃষ্ণ মিশনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে যান। অতএব তাঁর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা না করলে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাগত স্বকীয়তা বোঝা যাবে না।

সারদানন্দজীর সংগঠন ও পরিচালনা শক্তি সম্বন্ধে প্রথম ভবিষ্যবাণী করেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। তরুণ শরৎচন্দ্রের (ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী বেশে স্বামী সারদানন্দ) কোলে কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "দেখছিলাম ও কতটা ভার বইতে পারে।" মা-সারদাও সারদানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ও আমার বাসুকী" (পুরাণ-কথায় বাসুকী সাপ তার মাথায় পৃথিবীকে ধারণ করে আছে)।

ছোটবেলা থেকেই সারদানন্দজীর কতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। একদিকে যেমন তাঁর মধ্যে ধর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পেতে থাকে, অন্যদিকে আর্ত-পীড়িতদের প্রতি সমবেদনা ও সেবার ভারও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যেতো। স্কুলে পড়ার সময় জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে তিনি গরীব ছাত্রদের দান করতেন। আবার কোথাও কেউ অসুখে পড়েছে জানলে পড়াশোনা ছেড়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করা শুরু করতেন। তাঁর বাবার ওষুধের দোকান ছিল এবং সারদানন্দজী নিজে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। ফলে দুঃস্থ রোগীদের সেবা করা এবং ওষুধ-পথ্য দেওয়া তাঁর কাছে কোন সমস্যা ছিল না।

সেইসাথে মননশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আরেকটি উজ্জ্বল দিক। শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বলে গ্রহণ করার পর শরৎচন্দ্রের বাবা ভয় পান এই ভেবে যে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। একদিন

ছেলের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করেন, "আপনি একটু বললেই ও বিয়ে করবে।" শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, "উনি বললেই আমি বিয়ে করব কি না! যা কর্তব্য মনে করেছি, উনি বললেও তার অন্যথা হবে না।" পরবর্তীকালে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ) লিখতে গিয়েও তিনি ওই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য অবতারদের শিষ্যরা বা অনুরাগীরা গুরুর জীবনী লিখতে গিয়ে দেবভাবের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তাদের গুরুর মধ্যে কোনরকম অপূর্ণতা দেখতে পাননি। সারদানন্দজী কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী লিখতে গিয়ে দেবভাব ও মানবভাব দুই-ই আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্টই লিখেছেন, "কেহ কেহ হয়তো স্থির করিবেন, অবতার পুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয়সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেইজন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি—তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে হয়।" (সাধকভাব, পৃঃ ৩৪) বস্তুত নিজ গুরুর জীবনী লিখতে গিয়ে সারদানন্দজী যে-রকম objective দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন, তার উদাহরণ বিশ্বের সাহিত্য-ইতিহাসে বিশেষ নেই।

সাধু-শিক্ষার পরিকল্পনা

মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবন ছিল তপস্যা ও কর্মের মিলনসূত্র। সাধন-ভজনের ওপর তিনি খুবই জোর দিতেন। দিনের পর দিন বেলুড়মঠে তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে সারা রাত জপ-ধ্যান করেছেন, কখনও কখনও উদয়াস্ত জপধ্যান করে অন্যান্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তপস্যার সাথে সাথে বিদ্যাচর্চার ওপরও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার আগে তাঁর ওপর দায়িত্ব দিয়ে যান রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার জন্য। এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সারদানন্দজী তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "Thinking about the method to be adopted in the Math after S. V. goes. Course of study: History-Phil.—Science—

language-grammar-exercise and music. One day perfect rest." (26.5.1899). অর্থাৎ, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যাবার পর সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্ম প্রস্তাবিত শিক্ষাসূচীতে থাকবে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা, ব্যাকরণ, শরীরচর্চা ও সংগীতচর্চা। এতেই বোঝা যায় তিনি কতখানি আধুনিক মনের অধিকারী ছিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাসূচীর কথা চিন্তা করতে গিয়ে শাস্ত্রের আগে ইতিহাসকে গুরুত্ব দিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন, বহু সৎ প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে ইতিহাস সচেতনতার অভাবে এবং ভারতীয়দের অন্যতম মৌল ত্রুটি এই ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। এরপরই তিনি উল্লেখ করেছেন দর্শনের (Phil-Philosophy)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনা মানুষের মননশীলতা বাড়ায়, এটি তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। এবং তারপরই বিজ্ঞানচর্চার অভাবে খৃষ্টান চার্চ, ইসলামীয় সঙ্ঘ এবং মধ্যযুগীয় হিন্দুনেতারা কিভাবে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এটি তাঁর নজর এড়িয়ে যায় নি। এভাবে ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান-ভাষা-ব্যাকরণ শেখার সাথে সাথে শরীরচর্চা ও সঙ্গীতচর্চার ব্যবস্থা করে তিনি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী করতে চাইলেন। দেহে-মনে-আত্মায় সমভাবে উন্নত হওয়ার মধ্যেই যে আদর্শের যথার্থ ধারক ও বাহক গড়ে ওঠে, এটি তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়েছিল।

কর্মের দিক থেকে এক নিরলস চরিত্র ছিলেন তিনি। বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমেরিকায় যাবার পর ১৯০৩ সাল থেকে উদ্বোধন পত্রিকার পরিচালনগত দিক দেখা, নানান অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠা, বিবেকানন্দ সমিতি এবং বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির (ছাত্রাবাস) পরিচালনা, লীলাপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য বই লেখা, উদ্বোধনের জন্ম বাড়ি এবং বেলুড়মঠে ও জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দির তৈরী করা, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে যাওয়া ইত্যাদি কাজে তাঁর কর্মপ্রতিভার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

নেতৃত্বের দুই দিক

স্বামী বিবেকানন্দ নেতৃত্বের দুটি ত্রুটির উল্লেখ করে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমাদের জাতীয় জীবনের দুটি বড় দোষ— আমরা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই, এবং আমাদের পরে কি হবে তা নিয়ে ভাবিনা।" সারদানন্দজী

এই দুটি দোষ থেকেই মুক্ত ছিলেন। ক্ষমতার প্রতি তাঁর অদ্ভুৎ নিরাসক্তি ছিল। স্বামী উমানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী একবার সারদানন্দজীকে একটি চিঠি লিখে বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় চলে আসেন। ঐ চিঠিটি পুরনো চিঠির সাথে ভুল করে মিশে যাওয়ায় সারদানন্দজীর ধারণা হয় যে উমানন্দ তাঁকে না জানিয়েই চলে এসেছেন। এতে কর্তব্যানুরোধে তিনি সেদিন উমানন্দকে তিরস্কার করেন। পরে চিঠিটি খুঁজে পেয়ে তাঁর খুবই অনুতাপ হয়। ফলে উমানন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে গিয়ে জেনারেল সেক্রেটারী পদে রেসিগ্‌নেশন্‌ দিতে চান। আরেকবার স্বামী ভূমানন্দ নামে তরুণ সাধু রেগে গিয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে বললে সারদানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগের জন্য রাজি হয়ে যান। এমন-ই ছিল তার ক্ষমতায় অনাসক্তি। এমন কি ১৯২২ সালে মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করলেও ঐ সর্বোচ্চ পদ গ্রহণে রাজি হননি।

পরবর্তী নেতৃত্ব গঠনের বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে তরুণ সাধুদের নিযুক্ত করতেন তিনি—ত্রাণকাজে, আশ্রম পরিচালনায়, বক্তৃতা দেওয়ায় এদের এগিয়ে দিয়ে সাধুদের হাতে দায়িত্ব দিতেন। জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে তিনি কাজ করতেন অনুঘটকের (Catalyst) মতো। সাধুদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়ে তিনি পেছনে থাকতেন। সে-সময় মিশনের ট্রাস্টিবোর্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসী-শিষ্য থাকলেও ১৯২৬ সালে তিনি তরুণ সাধুদের (যাদের বয়স ছিল ৩০-৩৫) নিয়ে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। প্রতি দুই বছর অন্তর এই সদস্য বদলানো হত, যাতে অধিকসংখ্যায় তরুণ সাধুরা মিশনের পরিচালনগত দিকটির ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এই কমিটির কাজ ছিল সঙ্ঘ-পরিচালনার ব্যাপারে ট্রাস্টিদের সাজেশান দেওয়া এবং বিভিন্ন কাজে নেতৃত্ব দেওয়া।

নেতা ও কর্মী

সারদানন্দজী বিশ্বাস করতেন যে কর্মীদের স্বাধীনতা দেওয়া, তাদের কর্মদক্ষতায় বিশ্বাস করা ও তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়াই দক্ষ নেতার কর্মসাফল্যের রহস্য। মিশনের একটি শাখার অধ্যক্ষকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন,

"সকলের আত্মা চিরস্বাধীন বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সর্বদা স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছার উদয় হয়। যথার্থ নেতা কখনও তাহার ঐ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন না। কেবল ঐ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।" আরেকটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ক্রটিতে অসহনীয়তা, মন-মুখ এক রাখিতে না পারা এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে সকলকে বশে রাখিবার চেষ্টা অতি সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।" সারদানন্দজী কিভাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা হতে পেরেছিলেন তা ঐ দুটি চিঠি থেকেই বোঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শনকে ব্যবহারিক (practical) করে তোলার কথা বলেছিলেন। সারদানন্দজী সে দিকেই নজর দিয়ে বুঝেছিলেন, মানুষের আত্মার স্বরূপ স্বাধীনতা হওয়ায় সব মানুষই স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়! সারদানন্দজী তাই এই স্বাধীনতায় হাত দিতেন না, শুধু স্বাধীনতা যাতে উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন। নিজের ক্ষুদ্র অহং-এর ওপর ওঠার আকুতি মানুষের মধ্যে চিরকাল রয়েছে এবং বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে মানুষ সেই আকুতিকেই প্রকাশ করছে। রাজনৈতিক নেতারা সাধারণত এ-কথাটা বুঝতে চান না, যার ফলে আজ অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের নামে একজন বা সামান্য সংখ্যক নেতা সবার ওপর ছড়ি ঘোরান। তারা মনে করেন, সাধারণ মানুষ পশুর চেয়ে অল্পই উন্নত। এভাবে অধিকাংশ দেশের জনসাধারণই আজ নেতাদের উপর নির্ভরশীল। সারদানন্দজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এ-প্রসঙ্গে নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে। আইনের শাসন বেশিদিন চলতে পারেনা যদি মানুষের অন্তরসত্তার উদ্বোধন না ঘটে। আজকের ব্যাপক পলিটিক্সের যুগে নেতৃত্বের ক্রটিগুলি সারদানন্দজী স্পষ্টই দেখিয়ে দিয়েছেন।

কাজের প্রণালী

কাজ কিভাবে করতে হয় সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "যদি কাজ করতে চাও তবে ভগবানের ওপর নির্ভর করে নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না, আমারও না। কেউ তোমায় সাহায্য না করলেও তুমি একা ঐ কাজ করতে দেহপাত করবে, এ-রকম তেজ, সাহস ও ভগবানে নির্ভর নিয়ে যদি কাজ করতে পার তো কর।" সারদানন্দজী কিভাবে কর্মী গড়ে

তুলতেন তা এই কথাতেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্ভরতার ভাবটি বেশি থাকে। এই নির্ভরতা physical dependence তো বটেই, psychological dependence ও। ভারতের জাতীয় জীবনে এর কুফল ব্যাপক। গত শতাব্দীতে কংগ্রেসী নেতারা যেভাবে বৃটিশ সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাতেন 'দাও দাও' করে, স্বামী বিবেকানন্দ তার তীব্র প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে ভারতীয়রা ব্যবসা করা শুরু করুক চাকরীর পেছনে না ছুটে। পরবর্তীকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মুখেও স্বামীজীর প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। বৃটিশের কাছে ভারতীয়দের জন্য আরও বেশি চাকরীর সুযোগ দেবার প্রার্থনা জাতীয় জীবনে যে বিষ ঢুকিয়েছিল স্বাধীনতার পরও তার রেশ চলেছে। কি কংগ্রেস, কি কমিউনিস্ট, সব দলই জনসাধারণের জন্য আরও বেশি চাকরীর দাবীতে মুখর। সরকারে এসেও এরা বেকারভাতা বিধবা-ভাতা নিয়ে যতটা উৎসুক ও সরব, স্বাধীন ক্ষুদ্রশিল্পে উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে ততটা নয়। সাধারণ মানুষের মনেও এর ফলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে তাদের সব দুর্গতির মূলে দায়ী সরকার এবং তাদের সব সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও সরকারের। এইভাবে মানুষ ক্রমশ নেতাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং দেশে নানারকম পার্সনেলিটি কাল্ট্ গড়ে উঠেছে।

সারদানন্দজী বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের আত্মশক্তির জাগরণ ঘটালেই সব সমস্যার সমাধান হবে। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলতেন, "আমার মূলমন্ত্র—ব্যক্তিত্বের বিকাশ" সারদানন্দজী নেতা হিসেবে সেই আদর্শকেই রূপদান করেছিলেন। নিজে জেনারেল সেক্রেটারী হয়েও কর্মীদের বলছেন তাঁর ওপরও নির্ভর না করতে। তিনি বুঝেছিলেন, এই নির্ভরতার ভাবই মানুষের আত্মশক্তিকে ঢেকে রাখে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কোন ভদ্রলোক অল্পবয়সে হঠাৎ মারা গেলে তার স্ত্রী নিজেকে অসহায় বলে মনে করেন। কিভাবে সংসার চলবে, কিভাবে ছেলে-মেয়ে মানুষ হবে—এসব চিন্তা তাকে অধীর করে তোলে। কিন্তু পরে দেখা যায় ঐ ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছেন, শক্ত হাতে নিজেই সংসারের হাল ধরেছেন, উপার্জনের ব্যবস্থা করেছেন, ছেলে-মেয়েকে মানুষ করে তুলছেন। তাঁর মধ্যে যে শক্তি এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে লাগল। স্বামীর ওপর নির্ভরতার ভাব তার আত্মশক্তিকে ঢেকে রেখেছিল; নির্ভরতার ভাবটি কেটে যেতেই সেই শক্তি বেরিয়ে এল! তাছাড়া এই

নির্ভরতার সাথেই জড়িয়ে থাকে fear of insecurity বা নিরাপত্তার চাহিদা। মানুষ এজন্যই নির্ভর করে আত্মীয়-স্বজন, নেতা, অন্য মানুষের ওপর। মানুষ নিরাপত্তা চায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজে চিরস্থায়ী নিরাপদ বলে কিছু আছে কি? প্রথমত, এ-জগতে আছে মৃত্যু—স্ত্রীর, সন্তানের, বন্ধুর, আত্মীয়ের। দ্বিতীয়ত, সব মানবিক সম্পর্কই পরিবর্তনশীল বলে কারোর ওপরই চিরদিন নির্ভর করা যায়না। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলে গিয়েছিলেন, দেসদিমোনার মৃত্যু হয়েছিল ওথেলোর হাতে, কৈকেয়ীর জন্য রামকে সিংহাসন ছেড়ে বনে যেতে হয়েছিল, আর বর্তমান সমাজে তো এ-ধরণের ঘটনা অসংখ্য।

ভগবানে নির্ভর করে কাজ করার কথা কেন বললেন সারদানন্দজী? ভগবানের ওপর নির্ভরতার তাৎপর্য দুটি—যে-কোন পরিস্থিতিতেই অবিচলিত থাকা এবং নিষ্কাম কর্ম করা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে যে কাজ করতে পারে তার কাজেই সাফল্যলাভ হয়; যে-কোন পরিস্থিতিতে অবিচলিত থাকার অর্থ মাথা ঠাণ্ডা রাখা। নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে। ফলের আশা না করে কাজ করাকে নিষ্কাম কর্ম বলে। কিন্তু আমার কাজের লক্ষ্যের দিকে যদি নজর না থাকে, তবে কাজ করব কিভাবে? গান গাইবার সময় রাগ-রাগিনীর দিকে নজর দেব না? ক্রিকেট খেলায় বোলিং করার সময় ব্যাটসম্যানকে আউট করার চেষ্টা করব? আসলে, নিষ্কাম কর্ম বলতে এটি বোঝানো হয়নি। এর তাৎপর্য ভিন্ন। ধরা যাক নীতিবাদের প্রশ্নটি। আমি কেন ভাল হব? চুরি, খুন, মিথ্যাচরণ করলে আমাকে পুলিশ ধরবে—এই কারণেই যদি আমি ভালভাবে থাকি, এর অর্থ আমি শাস্তির (punishment) ভয়ে ভাল আছি। আর যদি ভাবি যে আমি ভাল হলে লোকেরা আমার প্রশংসা করবে তবে এর অর্থ পুরস্কারের (reward) লোভে আমি ভাল থাকছি। অর্থাৎ, আমার কাছে ভাল হওয়াটা বড় কথা নয়, মুখ্য হচ্ছে পুরস্কার কিংবা তিরস্কার। মানুষের কাজ করার পেছনে যদি এইগুলি উদ্দেশ্য (motive) হিসেবে থাকে তবে তার কাছে ঐ কাজটি হবে গৌণ, পুরস্কার বা তিরস্কারই মুখ্য। যেমন, দেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের আগে ভোটারদের কাছে প্রার্থনা জানান তাকে দেশসেবা করার সুযোগ দিতে। এই নেতাদের কাছে দেশসেবাটা গৌণ, ভোটে জেতাটাই মুখ্য। ফলে নির্বাচনের পর নির্বাচন হচ্ছে, এক দলের বদলে অন্য দল আসছে, কিন্তু দেশের মৌল পরিবর্তন বিশেষ হচ্ছে না। নিষ্কাম কর্মের তাৎপর্য—ঐ

পুরস্কার ও তিরস্কারের মোটিভ ত্যাগ করা। এটি ত্যাগ করলেই মানুষ নিরাসক্ত হয়ে কাজ করতে পারে এবং কাজটিই মুখ্য হওয়ায় সর্বশক্তি দিয়ে ঐ কাজটিকে সফল করে তুলতে পারে।

তিন ধরণের নেতা

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে দুই ধরণের নেতৃত্ব আমাদের চোখে পড়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। এক ধরণের নেতৃত্বের প্রতিনিধি হলেন হিটলার, স্তালিন প্রমুখ নেতা যারা শক্তি প্রয়োগ করে বিরোধীদের বশ করেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম ধর্ষকাম (Sadism)। আরেক ধরণের নেতা যেমন গান্ধীজী বিনোবাজী, যারা উপবাস বা আত্মপীড়নের সাহায্যে বিরোধীকে বশ করতে চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই মনোভাবের নাম মর্ষকাম (masochism)। ফ্রয়েডের মতে, এই দুটির পেছনেই আছে মনোবিকার (Perversion)। গান্ধীজীর উপবাসও এক ধরনের জোর-জবরদস্তি। স্যাডিজমের থেকে ম্যাসোকিজম অধিকতর মানবিক বলে পরিগণিত হলেও দুইয়ের মূলেই যে শক্তি প্রয়োগ—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—রয়েছে, এ-কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। স্তালিনের পার্জের (purge) মতো গান্ধীজীর উপবাসও এক ধরনের প্রেসার-ট্যাকটিকস (pressure tactics)।

সারদানন্দজী এই দুটি পথের সাহায্য কোনদিন নেননি। আমরা আগেই দেখেছি, তিনি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন আসলে, তিনি কখনোই মনে করতেন না যে তিনি সবার চেয়ে ভাল বোঝেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি", সারদানন্দজীও তাঁর জীবনে এটি পালন করতেন, তিনি কখনও দাবী করতেন না যে তাঁর মতই অভ্রান্ত। তিনি যে-পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, বর্তমান পৃথিবীতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেটিকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করে. অর্থাৎ পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হয়েও তিনি অলৌকিকতার দাবী করেননি। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর মেয়ের অল্পবয়সে বিয়ে দেবার সময় 'ঈশ্বরের সম্মতি'-র যুক্তি দিয়েছিলেন. গান্ধীজী অনেক সময়ই 'অন্তরের বাণী'র (inner voice) দোহাই দিয়েছিলেন। সারদানন্দজীও ধর্মনেতা হিসেবে যদি এ-ধরণের দোহাই দিতেন তবে হয়তো কেউ প্রশ্ন তুলতেন না, কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে

তিনি কখনও এ-ধরণের কথা বলেননি। তাঁর নিরাসক্ত ভাব আধুনিক এবং মননশীলতা এভাবেই আমরা বুঝতে পারি। আসলে, নেতা হয়েও তিনি নিজেকে সামান্য কর্মী বলে ভাবতেন। তাঁর নেতৃত্বে তাই কোন নাটকীয়তা বা গ্ল্যামার ছিল না। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও তিনি সবার সাথে মিশতে পারতেন নিরহংকার ছিলেন বলেই।

রামকৃষ্ণ মিশন তার প্রাথমিক অবস্থায় এ-রকম একজন আদর্শ নেতাকে পেয়েছিল বলে সঙ্ঘ যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পেরেছিল, তেমনি বহু ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে পেরেছে অতি সহজেই। সে-সময় বহু বিপ্লবীকে সারদানন্দজী সঙ্ঘে স্থান দেন, এমন-কি মাণিকতলার বোমার মামলার আসামী দেবব্রত ও শচীনকে বেলুড় মঠে থাকতে দেন। এসব ঘটনায় বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন এবং এর ফলে মিশনকে নিষিদ্ধ (banned) করে দেবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এই দুর্যোগেও সারদানন্দজী যেভাবে তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে মিশনকে পরিচালনা করেন তা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ প্রতীক ও লোকচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

মানবচেতনার মৌল আকুতি

এই বিশ্বে সবচেয়ে মহান সম্পদ মানুষের চেতনা। বিশ্বের সবচেয়ে প্রগতিশীল শক্তিও এটিই। বিভিন্ন দেশ-কালে এই মানবচেতনা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে নানান ক্রিয়াকাণ্ডে। কিন্তু এই যে শক্তি মানবচেতনা, এর গভীর বা মৌল আকুতি কি? ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যুগ-যুগ ধরে মানুষ চেষ্টা করছে পূর্ণতাপ্রাপ্তির, মুক্তির কামনাই মানুষের সব বাসনা ও ক্রিয়ার মূল। সে মুক্তি চাইছে এই বহির্জগতের বিভিন্ন শক্তির হাত থেকে, অন্তরজগতের দ্বন্দ্বময় অবস্থা থেকে এবং সে মনে করেছে এই মুক্তির পথেই সে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। এই যে পূর্ণতাপ্রাপ্তি বা মুক্তি, এটি সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা—আদিম মানুষ আর আধুনিক মানুষের ধারণাও এ-বিষয়ে এক নয়। তবুও মূল উৎস হিসেবে এই পূর্ণতা বা মুক্তির কামনাকে বাদ দেওয়া যায় না।

সেই সাথেই মানুষ সবকিছুর মধ্যে খুঁজতে চেয়েছে কার্য-কারণ সূত্র। এটিই মানুষকে ক্রমশ বিচারশীল করে তুলেছে, যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে। ঋকবেদের প্রথম ঋষিরা প্রশ্ন তুলেছিলেন: দিনের বেলায় নক্ষত্রেরা কোথায় যায়, এই শূন্যে পৃথিবীকে কে ধরে রেখেছে! আমরা যাকে কুসংস্কার বলি, তার পেছনেও আছে এই কার্য-কারণ সূত্র খোঁজার চেষ্টা। কোন এক মাসের তেরো তারিখে কারো জীবনে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। সে এই ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্য কিছু না পেয়ে ঐ তারিখটিকে দায়ী করলো। যথার্থ কারণটি খুঁজে না পেলেও মানুষ একটা মনগড়া কারণ বের করতে চেয়েছে। এবং এভাবেই কুসংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে।

মানবচেতনার মৌল আকুতিটিকে আমরা আপাতত mythical consciousness বলে ধরতে পারি, কারণ এই পূর্ণতার তাগিদ মানুষ যুগ-যুগ ধরে অনুভব করলেও সে এটিকে ভাষায় পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারেনি। বিজ্ঞানের শুরু alchemy থেকে। প্রাচীন মানুষ খোঁজ করেছিল পরশপাথরের, যার ছোঁয়ায় সব সোনা হয়ে যায়। তার কাছে সোনা শুধু একটি ধাতুই ছিল না,

ছিল পূর্ণতার একটি প্রতীক (symbol)—যে-কোনো তাকে দেবে মুক্তির স্বাদ, অমরত্বের ছোঁয়া। মিশরের পিরামিডগুলিও সেই পূর্ণতার প্রতীক, যা টিঁকে থাকবে যুগ-যুগ ধরে, প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে। আদিম ধর্মের শুরুও এভাবে। আদিম মানুষ কল্পনা করেছে স্বর্গের, যে-স্বর্গ তার কাছে মুক্তির আবাসস্থল। রাজনীতির অঙ্কুরও প্রকাশিত হয়েছিল এভাবে। বন্য পশু, অন্য গোষ্ঠীর মানুষ, এবং নিজের গোষ্ঠীতে বিবাদ আদিম মানুষকে বারবার কষ্ট দিয়েছে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে বুঝেছে, নিজের দলে সুনির্দিষ্ট আইন কানুন চালু করে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিরোধীদের মোকাবিলা না করলে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সুখে বেঁচে থাকা অসম্ভব। Human excellence-এর তাগিদে এভাবেই আইনবদ্ধ গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল যার ক্রমপরিণতি রাষ্ট্রনীতি। শিল্পের জন্মও এভাবে। আদিম শিল্পীর কাছে আনন্দই ছিল পূর্ণতার প্রতীক। সেই পূর্ণতাকে সে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে গুহার দেয়ালে। এই মৌল চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে মানুষ শুধু তার পরিবেশ বা পৃথিবীকেই পাল্টায়নি, সেইসাথে বদলিয়েছে নিজেকেও। এভাবেই তার চেতনার বিকাশ হয়েছে।

বহু যুগ কেটে গেলেও মানুষের এই আদিম চেতনা হারিয়ে যায়নি। অ্যালকেমি থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানের। আজও মানুষ বিশ্বাস করে বিজ্ঞানের সাহায্যে সে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। একে আমরা নাম দিতে পারি Science-myth—মানুষ মনে করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে মানুষের অনন্ত উন্নতি সম্ভব। আজকের সাধারণ একজন মানুষকে প্রশ্ন করুন—আগামী ৩০ বছরে পৃথিবীর সব পেট্রোল শেষ হয়ে যাবে, তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? লোকটি নিরুদ্বেগ মনে উত্তর দেবে—এই ৩০ বছরের মধ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবেন যার সাহায্যে আমরা ঐ সংকট থেকে উদ্ধার পাব। বিজ্ঞান-মিথের মতো রাজনৈতিক মীথও সমভাবে জোরালো সাধারণ মানুষের কাছে। তারা বিশ্বাস করে গান্ধীবাদ/মার্কসবাদ/সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র ইত্যাদি পথের সাহায্যে পৃথিবীতে স্বর্গ গড়ে তোলা সম্ভব। এই মিথ-চেতনাকে না বুঝলে মানবচেতনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়না। ম্যাকসমূলার লিখেছেন, "Mythology is inevitable, it is natural, it is an inherent necessity of language,

if we recognize in language the outword form and manifestation of thought. Mythology in the highest sense, is the power exercised by language or thought in every possible sphere of mental activity." (The Philosophy of Mythology, appended to Introduction to the Science of Religion, London, 1873, pp.353-55).

লোকচেতনা ও প্রতীক

এই যে মানবচেতনা বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির আকুতি, এই আকুতি, বিভিন্ন দেশ-কালে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আর এইসব নানান রূপকেই আমরা এখানে লোকচেতনা বলে উল্লেখ করছি। এই লোকচেতনা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করছে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও পরিবেশ। এ-সত্ত্বেও কিন্তু সব লোকচেতনার পেছনেই কাজ করছে মানব চেতনার সেই মৌল বা গভীর আকুতি। কলকাতার কথাই ধরুন। যে বিষয়গুলির বাহুল্য এখানে দেখা যায় তার মধ্যে তিনটির উল্লেখ আমরা করতে পারি—দুর্গাপূজো, হিন্দী সিনেমা ও বামপন্থী রাজনীতি। দুর্গাপ্রতিমায় আমরা দেখি মহিষাসুরের বিরুদ্ধে দেবীর জয়—অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয়। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে যাবার উপায় হিসেবে অন্যায় ও মিথ্যার পরাজয় এবং সত্য ও ন্যায়ের জয় নির্দিষ্ট করেছে মানুষ। হিন্দী সিনেমায় ভিলেন যত শক্তিশালী ও ধনী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত হিরোর কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতেই হয়। বামপন্থী রাজনীতির প্রচারিত শ্রেণীসংগ্রামেও একই চেতনার প্রতিফলন। মা দুর্গা, হিরো, এবং সর্বহারা শ্রেণী এখানে সত্যের প্রতীক। সত্য বা ন্যায় সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যাই হোকনা কেন, সে এইটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চাইছে ঐ তিনটি মীথের মধ্য দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই তিনের মধ্যে কোন মিল নেই, কিন্তু চেতনার গভীরে উৎসমুখে এগুলি এক। এই লোকচেতনার আধারেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দেশ ও জাতির সংস্কৃতি (culture)। সেজন্য বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও গভীর একটি ঐক্যের বা সমতার সূত্র পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "সমগ্র পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest করেছিল, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়রা সেইটিকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে

manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৩১-৪) "সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজ-এ বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিন্দুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকশিত হয়েছে।" (ঐ, ৬ : ১৬০)।

এই লোকচেতনার প্রকাশে এক বিরাট ভূমিকা নেয় প্রতীক (symbol)। মানবচেতনায় যা ছিল নীরব আকুতি, লোকচেতনায় তা প্রকাশিত হয় ইন্দ্রিয়ের ধরা-ছোঁয়া বস্তুর মাধ্যমে; concept এবং sense-perception এই দুয়ের মিলনে প্রতীক আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা যেমন প্রকাশ করে জাতির লোকচেতনার বৈশিষ্ট্যময় দিকটিকে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতীক (জোড়া বলদ, কাস্তে-হাতুড়ি, প্রদীপ ইত্যাদি) তেমনি প্রকাশ করে দলগুলির চেতনার বৈশিষ্ট্যময় দিকগুলিকে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির প্রতীক (ওঁ, ক্রস, চাঁদ-তারা) কিংবা সামাজিক প্রতীকেও (সিঁথিতে সিঁদুর, পৈতে, টুপি ইত্যাদি) একইভাবে ফুটে ওঠে লোকচেতনার বিভিন্ন দিক। প্রতীকের ব্যবহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও রয়েছে। প্রতিটি ভাষাই (language) প্রতীক। 'আমি যাচ্ছি' 'আই অ্যাম গোইং' এবং 'ম্যায় জা রহা হুঁ' এই তিনটি বক্তব্য একই ভাবকে প্রকাশ করছে। লোকচেতনার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব। (এ-প্রসঙ্গে বলি, স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভাষা ও লোকচেতনার [বা সংস্কৃতির] পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দ্রষ্টব্য; বাণী ও রচনা ৬:৩৫-৭ এবং ৯:২৪। পাশ্চাত্যে Humboldt, Whorf প্রমুখ পণ্ডিতেরাও এ-নিয়ে আলোচনা করেছেন।) বিজ্ঞানের নানান শাখায় প্রতীকের ব্যবহার ব্যাপক—অঙ্ক, ফিজিক্স্, কেমিস্ট্রি ইত্যাদিতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের প্রতীক ব্যবহার করা হয়। আবার একই প্রতীক বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। Space শব্দটির দ্বারা একজন ফিজিসিস্ট যা বোঝান, একজন সাইকোলজিস্ট কিন্তু ঠিক তা বোঝান না। শিল্পের (art) ক্ষেত্রেও প্রতীকের ব্যবহার বহুল। বস্তুতপক্ষে মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার এত ব্যাপক হয়ে গেছে যে ছোটবেলা থেকেই শিশুকে বিভিন্ন প্রতীক সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হয়। ধর্মীয় প্রতীকগুলির পেছনে কাজ করছে মানুষের যৌলচেতনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছিলেন "সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে চাইছে" এবং "সেখানে সব শেয়ালের এক রা" তখন তিনি মানবচেতনার প্রাথমিক ও চরম

স্বরভুটিকে নিজস্ব ধর্মীয় পরিভাষাতেই প্রকাশ করেছিলেন। পূর্ণতাপ্রাপ্তির আকুতিতেই মানবচেতনার শুরু। চেতনার পূর্ণবিকাশে এই পূর্ণতাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত করেছেন। সুন্দর একটি উপমা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এক পুকুরের চারিটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে, বলছে জল ; মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে পানি ; ইংরাজরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে ওয়াটার ; আবার অন্য লোক এক ঘাটে, বলছে অ্যাকোয়া।" ঠিক একই ধরণের কথা বলেছেন অস্তিত্ববাদী জাঁ পল সার্ত্রে—"প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের যেসব বাস্তব অথবা কল্পনাগত লক্ষ্য থাকে এবং যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত ইত্যাদি প্রশ্ন জড়িত, সেই সব লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে প্রত্যেক মানুষের একটা লক্ষ্য থাকে যাকে আমি বলব সর্বাতিক্রমী বা পরম, এবং সেই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু ঐ সব বাস্তব লক্ষ্য অর্থবহ হয়। অতএব একজন মানুষের কাজের অর্থ হল ঐ লক্ষ্য, যা অবশ্য বিভিন্ন মানুষ অনুসারে বিভিন্ন, কিন্তু যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তা পরম। এবং আশা এই পরম লক্ষ্যের সঙ্গে আবদ্ধ। অবশ্য ব্যর্থতাও, এই অর্থে যে, সত্যিকার ব্যর্থতা ঐ লক্ষ্যেরই সম্পৃক্ত বিষয়।" (সার্ত্রে ও তাঁর শেষ সংলাপ, অনুবাদক অরুণ মিত্র, কলকাতা,

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে বিভিন্ন দেশ-কালে ঐ মানবচেতনা ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রতীকের সৃষ্টি মানুষের মনের অবস্থা অনুযায়ী। অর্থাৎ, মানবচেতনাটি বিশ্বজনীন কিন্তু প্রতীক স্থান-কাল-পাত্রের দ্বারা সীমায়িত ; ফলে লোকচেতনার বিভিন্ন প্রকাশ আমরা দেখি। এখানে মানবচেতনাটি হল subjective দিক আর লোক-চেতনা objective দিক। হিন্দুদের বিভিন্ন শাখা, যেমন বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব ইত্যাদি, কিংবা খৃষ্টান-ইসলাম-বৌদ্ধ ইত্যাদি অ-হিন্দু ধর্মগুলির পেছনে বা ধর্ম সাধনার উৎসে মানুষের যে-আকুতি প্রকাশিত হয়েছিল সেই আকুতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এবং সব ধর্মেই যখন সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল তখন প্রশ্ন ওঠে—তারা কিসে সিদ্ধ হয়েছিলেন ? যে আকুতিতে তাঁদের ধর্ম সাধনার শুরু, সেই আকুতির বাস্তবায়নের পূর্ণতার মধ্যে নিশ্চয়ই ! সুতরাং সব ধর্ম সাধনার গোড়ার কথা এক, একটাই মৌল আকুতি, শ্রীরামকৃষ্ণ যেটিকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন "সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে চাইছে।" আর শেষেও তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "সেখানে সব শেয়ালের এক রা।"

প্রতীক, কর্ম ও বাস্তবায়ন

প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষের মৌল আকুতি যাকে আমরা মানবচেতনা বলে উল্লেখ করেছি সেটি সবার ক্ষেত্রে একই, এ-কথা আমরা ধরে নিচ্ছি কেন? এটা কি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার? না, তা নয়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই আমরা দেখেছি যে ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, শিল্প ইত্যাদি সব কিছুর পেছনেই রয়েছে ঐ মৌল আকুতিটি। এখানে অন্য একটি দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

বহু কোটি বছর ধরে প্রাণী জগতের যে ক্রমবিকাশ চলছিল প্রধানত দৈহিক স্তরে, মানুষের আবির্ভাবের পর সেই ধারা চলে এল মানসিক স্তরে। প্রস্তর-যুগের মানুষ তার মানসিক স্তরে ক্রমবিকাশ লাভ করেই বিংশ শতাব্দীর মানুষে পরিণত হয়েছে। গাছের ফল-মূল আর পশুর মাংস দিয়ে সে তার দেহের ক্ষিদে মিটিয়েছে। এরপরই এসেছে মনের ক্ষিদে মেটানোর তাগিদ। এই ক্ষিদে মেটাতেই আদিম মানুষ গুহায় ছবি এঁকেছে, তৈরী করেছে মাটির পুতুল, জানতে চেয়েছে বৃষ্টি কেন হয়। ভূমিকম্পে কোন্ দৈত্য মাথা নাড়ে। সমস্ত রহস্যের পেছনেই একটা যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেছে। সে শিখেছে আগুন জ্বালাতে, গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে বাড়ি আর কাপড় তৈরী করতে। উদ্দেশ্য ছিল অন্ধকার-বৃষ্টি-রোদ-ঝড়-শীতকে জয় করা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। বহিঃপ্রকৃতিকে মানুষ যত বেশি জয় করছে, তার সভ্যতা ততই উন্নত হচ্ছে। বড় হচ্ছে মানুষ, তার সাথে সাথে রহস্য ভেদ করতে চাইছে দূরের ঐ নীলাকাশের, পৃথিবীর, মাটির, জলের; আপন-জনের মৃত্যুতে চিন্তা করছে মৃত্যু কি, আর জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি। এভাবেই উন্নত সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম। সমস্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই কিন্তু একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—সসীম (finite) মানুষ অসীম (infinite) হতে চাইছে। স্বামী বিবেকানন্দ একেই "ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমণের চেষ্টা" (attempt to transcend the limitation of senses) বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ বারবার চেষ্টা করেছে কোন-না-কোন ধরণের পূর্ণতাপ্রাপ্তির। এই পূর্ণতাকে সে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। এই যে অসীম হবার চেষ্টা, পূর্ণ হবার প্রয়াস, এরই প্রতিফলন ঘটেছে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মের চিন্তাধারার মধ্যে। এ-সমস্ত প্রয়াসের সমষ্টিই সংস্কৃতি। যে জাতি যত সুন্দরভাবে যত সার্থকভাবে

অসীমের সাথে তার মিলনের আকুতি প্রকাশ করতে পেরেছে, যত গভীরভাবে সেই অসীম বা পূর্ণতাকে অনুভব করতে পেরেছে নিজের শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে, সেই জাতির সংস্কৃতি তত উন্নত হয়েছে।

যে মানবচেতনা প্রতীকের আশ্রয়ে লোকচেতনায় পর্যবসিত হয় সেই চেতনাই প্রকাশিত হচ্ছে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায়, বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত শাখায় (technology), ধর্মের সাধনায়। অর্থাৎ যে expression মানুষের মধ্যে দেখা যায় সে-সবের পেছনেই রয়েছে মৌল মানব-চেতনা। এই expression কখনও সফল, কখনও ব্যর্থ। মানবচেতনাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে মানুষ concept এবং sense-perception-এর মিলনে অধরাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছে। এই চাওয়ার প্রয়াসে সে নানান ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এসব ক্রিয়াকাণ্ড কখনও সফল হয়েছে, কখনও বা ব্যর্থ। ব্যর্থ হলে মানুষ আবার তার কারণ অনুসন্ধান করেছে ক্রিয়াকাণ্ডকে সঠিক করে তোলার জন্য। এই সফলতা-ব্যর্থতা এবং রূপদান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে জ্ঞান। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, mythology-র পরবর্তী পর্যায় theology, এবং তারপর এসেছে philosophy। মার্কসবাদী রাজনীতির কথাই ধরা যাক। মার্কস তাঁর মনের মধ্যে যে সুন্দর পৃথিবীর জন্য আকুতি বোধ করেছিলেন সেই আকুতিটি ছিল mythical consciousness ; এবং শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন কমিউনিস্ট সমাজের যে ছবি এঁকেছেন তা হল mythology। শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, সর্বহারার একনায়কত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে যে-সব কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন তা হল theology বা rituals। আর চীন-রাশিয়ার সফলতা-ব্যর্থতা থেকে যে নব-মার্কসবাদী চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে (New-left movement, New-Marxism, ইত্যাদি) সেগুলি হল philosophy পর্যায়ভুক্ত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে alchemy ছিল mythology। পরশ পাথরের খোঁজে মানুষ যে-সব অনুসন্ধান করেছে (এখানে theology) তারই পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে Chemistry, Medicine, Botany ইত্যাদি। (এখানে philosophy)। এসব প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে মৌল মানবচেতনা যা আমরা আগেই পূর্ণতাপ্রাপ্তির আকুতি বলে উল্লেখ করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজস্ব ধর্মীয় পরিভাষায় এ-কথাই বলে গেছেন। 'যত মত তত পথ' স্বীকার করেও তিনি বলছেন "মত-পথই সব নয়, সাধন চাই।" অর্থাৎ,

কেবল প্রতীক বা ক্রিয়াকাণ্ড হলেই হবে না, এগুলির মধ্য দিয়ে সঠিক জ্ঞানে উপনীত হতে হবে। একদিনের ঘটনা—দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে বহু লোক এসেছে। তাদের মধ্যে এক ভদ্রলোকের হাতে জপের মালা, তিনি সব সময় জপ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই বললেন, "আচ্ছা, এরা এত জপ করে, কিন্তু কিছুই হয় না কেন?"—আরেক-দিন ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্য হরিনাথকে (পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ) যে-উপদেশ দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন।·· ঠাকুরের সেদিনের কথাতেই [হরিনাথ] বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য।·· ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধন ভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কলকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধন সহায়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ৩ : ৭৫-৭৬ পৃ:)

শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময়ই জোর দিয়েছেন মানুষের মৌল আকৃতির বাস্তবায়নের দিকে। তিনি বুঝেছিলেন যে মৌল চেতনায় সব মানুষ এক এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে মানুষ সেই আকৃতিকেই বাস্তবায়িত করতে চাইছে। এজন্য কোন ক্রিয়াকাণ্ডকেই তিনি ছোট করে দেখেননি, কিন্তু মানুষকে সচেতন করেছেন এই দিকে যে ক্রিয়াকাণ্ডে বা প্রতীকে থেমে থাকলে চলবে না, এগুলির মধ্য দিয়ে সঠিক জ্ঞানে পৌছুতে হবে, মৌল আকৃতিকে বাস্তবায়িত করে তুলতে হবে।

ইতিহাসে মীথের ধারা

ধর্মের মাধ্যমে মানুষের যে মৌল আকৃতি সুপ্রাচীন যুগে দেখা দিয়েছিল তার প্রকাশ ঘটেছিল পিতৃ-উপাসনা ও প্রকৃতি উপাসনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী-যুগে কখনও পুরোহিত কখনও রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হলেন। ভারত-মিশর-গ্রীস-ব্যাবিলনের ইতিহাস আমাদের এই তথ্যই দেয়। এরপরের যুগে ভারতীয় লোকচেতনায় নতুন চিন্তা দেখা যায়। তখন মানুষ আর ঈশ্বরের প্রতিনিধি নয়, ঈশ্বরের সমতুল্য হতে চাইছে। কিভাবে ঈশ্বরের

সমতুল্য হওয়া যায় ? criminal হয়ে। ঈশ্বর সবচেয়ে বড় criminal কারণ তিনি নির্দোষ মানুষকে শাস্তি দেন, অসহায়কে যন্ত্রণা দেন। ভারতীয় লোক চেতনায় তাই আবির্ভূত হয় রাবণ, হিরণ্যকশিপু, মহিষাসুর—নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে এরা ঈশ্বরের সমতুল্য হতে চায়। দু'শ বছর আগে ফরাসী দার্শনিক মার্কুইস-দ্য-সাদও তাই বলেছিলেন : বিদ্রোহ কর, অপরাধ করার অধিকার দাও, মানুষকে দাও শক্তিপ্রয়োগের অবাধ অধিকার। পরে দেখা দিল নতুন চিন্তা। অমরত্বের বর পেয়েও মানুষ তা ধরে রাখতে পারে না, কোন না কোন ছিদ্র-পথে তার মৃত্যু হয় ; ঈশ্বর জিতে যান মানুষের এই মরণশীলতার জন্য। ক্ষোভে মানুষ তাই বিদ্রোহ করে, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়। রাজসভায় দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে চেয়েছিল ; তারও আগে শ্রীকৃষ্ণ একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, বলেছিলেন : কেন ইন্দ্রের পুজো করব ? আজ থেকে ইন্দ্রের পুজো বন্ধ। এ-ধারা চলে এসেছে এই সেদিনও। বাংলা মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগর কিংবা মেঘনাদবধ কাব্যের রাবন ও ইন্দ্রজিৎ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে লোকচেতনার এই দিকটিই প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন পাশ্চাত্যে মিলটনের শয়তান-চরিত্র ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছিল। পাশাপাশি আরেকটি ধারাও আমরা দেখি। কপিল মুনি ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেন এবং বুদ্ধদেব নির্বাক হয়ে রইলেন, কিন্তু দুজনেই 'ঈশ্বর' হয়ে উঠলেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মানুষ নিজেই ঈশ্বর হতে চাইল, ঈশ্বরের স্থানে বসার প্রয়াস করল। নীৎসের অতিমানব এই মতেরই প্রবক্তা। কমিউনিস্ট সম্প্রদায়ে মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং, হো-চি-মিনও একই পথের পথিক। গত দুই শতকে ভারতে দেখা দিল নূতন চিন্তা। বহু মনীষী ও সমাজনেতা আবির্ভূত হয়ে জাতিকে পথ দেখাবার চেষ্টা করলেন। এঁদের অনেকে যেমন সরাসরি ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পাথেয় করে এগোতে চাইলেন, অনেকে আবার ঈশ্বরের স্থানে বসাতে চাইলেন অন্য কিছুকে। 'ঈশ্বরের স্থানে' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্থানে, সাত্রে'র ভাষায় যা 'পরম' তার স্থানে। অক্ষয়-কুমার দত্ত বসালেন বিজ্ঞানকে, ডিরোজিও যুক্তিকে, কবি ঈশ্বর গুপ্ত মাতৃ-ভাষাকে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বজাতির ইতিহাসকে। পাশ্চাত্যেও দেখি একই ধারা। ঈশ্বরের স্থানে দস্তয়েভস্কি বসাতে চাইলেন ন্যায়কে, রুশো জন-সাধারণের ইচ্ছেকে, হেগেল রাষ্ট্রকে, আর মার্কস সর্বহারা শ্রেণীকে।

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের যে বিভিন্ন চিন্তাধারা দেখা গেছে তা এভাবেই

মূলত ঈশ্বরকেন্দ্রিক। মানুষ কখনও ঈশ্বরের সমতুল্য হতে চেয়েছে, কখনও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনো বা নিজেই ঈশ্বর হতে চেয়েছে, কখনও আবার জায়-রাষ্ট্র-শ্রেণী-ভাষা-স্বদেশ-বিজ্ঞান ইত্যাদির কোন একটিকে ঈশ্বরের স্থানে বসিয়েছে। মানুষ এটা করতে চাইছে কারণ এটাই তার মৌল প্রবৃত্তি যাকে আমরা মানবচেতনা বলে আগে উল্লেখ করেছি, সার্ত্রে যাকে বলেছেন 'পরম'। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকজীবনের এই গভীর সত্যটিকে শুধু যে বুঝতে পেরেছিলেন তা-ই নয়, আরও গভীরে গিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এর কারণ। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি : 'কাঠে আগুন জ্বলে কেন ? কারণ কাঠে অগ্নিতত্ত্ব আছে।' রূপকের ভাষায় বলা এই উক্তির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন যে মানুষের বৃহৎ চিন্তা মাত্রেই ঈশ্বরকেন্দ্রিক, কারণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরসত্তা আছে। নরেন-রাখাল-বাবুরাম প্রমুখ ত্যাগী শিষ্যদের মধ্যে তিনি যেমন 'নারায়ণ'কে দেখতেন, তেমনি বারাঙ্গনাদের মধ্যেও 'মা'কে দেখেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষ নিজের মধ্যে যে অসীম শক্তি অনুভব করছে—সচেতন বা অবচেতনভাবে—ঈশ্বরে সেগুলিই মূর্ত দেখতে চেয়েছে। হিমালয়ের চূড়ায় মানুষ কেন ওঠে ? কেন যায় সমুদ্রের অতলে ? সৌরমণ্ডল ভেদ করে কেন রকেট পাঠায় মহাকাশে ? দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য—এমন কথা কেউ বলবেনা। আসলে মানুষ তার প্রকৃতিদত্ত শক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, সসীম মানুষ অসীম হতে চায়। ডাক্তারী বিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কারে মানুষ চাইছে মৃত্যুকেও জয় করতে। সুদূর অতীতে উপনিষদের যুগে ভারতেরই এক নারী মৈত্রেয়ী বলেছিলেন : যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—যা দিয়ে আমি অমৃত হতে পারবনা, যা আমাকে অসীমের উপলব্ধি দেবে না, তা দিয়ে আমি কি করব ? বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, সমাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য—সবকিছুরই উৎপত্তি ও গতি মানবমনের এই গভীর আকুতি থেকে। সসীম মানুষ অসীম হতে চাইছে। এই সাড়ে-তিন-হাত শরীরটাই যে মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়, চার দেওয়ালের মাঝের জায়গাটুকুতেই যে তার সামগ্রিক অস্তিত্ব নিহিত নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ই যে তার উপলব্ধির একমাত্র দরজা নয়—এই কথাটাই মানুষ বলতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে। কিন্তু কেন চাইছে ? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম, স্বরূপত সে অসীম, অনন্ত, ভূমা। তার দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরাত্মার সেই বাণী সে শুনতে

পাচ্ছে—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে সুখ নেই, ক্ষুদ্রত্বে আনন্দ নেই, বৃহত্তেই সুখ, অসীমেই আনন্দ। কস্তুরী মৃগের মতো সে ছুটে বেড়াচ্ছে অন্তরাত্মার খোঁজে। এই নিরবিচ্ছিন্ন মুক্তি-অভিযানেরই আরেক নাম ইতিহাস।

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতির মধ্যেও এই সত্যের প্রমাণ পাই। সাধক অবস্থায় কালীপ্রতিমার পায়ে ফুল দিতে গিয়ে বারবার ফুল দিয়েছেন নিজের মাথায়। সমস্ত সাধনার শেষে ষোড়শীপুজোয় সাধনার ফল আর জপের মালা অর্পণ করলেন মানুষেরই পায়ে। আবার পৃথিবীর মঞ্চ থেকে বিদায় নেবার আগে কাশীপুরের শেষ শয্যায় যে-ফটোতে তিনি শেষবারের মতো ফুল দিলেন সেই ফটোটিও ছিল মানুষের। এই তিনটি ঘটনা তাৎপর্যময়। দেবতার ফুল বারবার গিয়ে পড়ছে মানুষের কাছে। সাধক-অবস্থায় যে-শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন—"মা, আরেকটা দিন চলে গেল, দেখা দিলি না!" সাধনার শেষে তিনিই কেঁদেছেন মানুষের জন্য: "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন।

বিভিন্ন জাতি ও নীথ

বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমরা কতগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। কোন জাতির পক্ষে উন্নতি করতে গেলে—স্বামী বিবেকানন্দের মতে—সেই জাতির মূলভাব অনুযায়ীই তা করা উচিত। তিনি বলেছেন, "সকল জাতিরই এক-একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি, কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও বা মানসিক উন্নতিবিধান, কাহারও বা অন্য কিছু।" "প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতি-নীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া আর সমস্ত রীতি-নীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতি-নীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশি এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।" ফরাসী, ইংরেজ ও ভারতীয়দের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী ব্যাখ্যা

করেছেন বিষয়টি। তাঁর মতে, উন্নতির সময় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকেই জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে বিশ্বসংস্কৃতিতে সেই জাতির আসন নেওয়া প্রয়োজন। বিশ্বসংস্কৃতি যেন একটি বহুতন্ত্রী বীণা এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলি তার এক-একটি তন্ত্রী। বীণার প্রতিটি তারের স্বরবৈশিষ্ট্য হয়েছে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সমস্ত তারগুলি যখন স্বীয় স্বরবৈশিষ্ট্যে ঝংকৃত হয়ে ওঠে তখনই বহুতন্ত্রী বীণার সম্মিলিত স্বরমাধুর্য এক অপূর্ব স্বরলহরীর সৃষ্টি করে। এ ভাবেই স্বামীজী আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে জাতীয়তাবাদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন।

বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে কি-না এবং জাতীয় উন্নতির সময় সেই বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত কি-না এ-বিষয়ে মার্কস সরাসরি কিছু বলেন নি। যদিও তিনি প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে চারটি সংগঠনের (এশিয়াটিক, স্ল্যাভোনিক, প্রাচীন ক্লাসিকাল এবং জার্মানিক) উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি বিশ্বের অর্থ-নৈতিক প্রগতিতে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন গতিপ্রকৃতির কথা বলেছেন, যদিও তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজদ্বয়ের অগ্রগতিতে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন, তবুও জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কোন ব্যাখ্যা তার রচনায় নেই। কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর না দিয়ে বিপ্লবের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় আসা সম্ভব নয়। ফলে, পরবর্তীযুগে মার্কসবাদের নানান ভাষ্যে বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদীরা নিজ নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন। ইতালীর এন্টনীও গ্রামসী এবং তোগলিয়াত্তি, ফ্রান্সের মরিস থোরেজ ও জর্জেস পুলিটজার, বালগেরিয়ার তোদর পাভলভ, বৃটেনের মরিস কনফর্থ, জাপানের কেনজুরো ইয়ানাগিদ, যুগোস্লাভিয়ার টিটো, কোরিয়ার কিমইলসুং প্রমুখের লেখা পড়লেই এ-বিষয়টি ধরা পড়ে। মার্কসবাদী গণতন্ত্রের রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাও সেতুং সরাসরিই বলেছেন, "This new-democratic republic will be different from the old European-American form of capitalist republic……On the other hand, it will also be different from the socialist republic of the Soviet type under the dictatorship of the proletariat which is…in the U. S. S.R… for a certain historical period, this from (i.e. Soviet type) is not suitable for the…colonial and semi-colonial countries, there,

'fore, a third form of state must be adopted in ..all colonial and semi-colonial countries, namely, the new-democratic republic." (Selected Works, Calcutta vol. 2, p. 350) "New-democratic culture is national. ...It belongs to your own nation and bears our own national characteristics." (Ibid, p. 380) ।
চীন-রাশিয়ার গায়ে লাগানো মার্কসবাদী রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া। তার প্রধান রাষ্ট্রনায়ক কিমইলসুং জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "Some advocate the Soviet way and others the Chinese, but is it not high time to work out our own ?" (Selected Works, pyongyang vol. 1, p. 591)। রুশ নেতৃত্বের প্রতি সেই বিখ্যাত গোপন চিঠিতে প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক সলঝেনিৎসিনও একই কথা বলেছেন, "To run a country like Russia you need to have a national policy and to feel constantly at your back all the eleven hundred years its history, not just the last fifty-five [years]—five per-cent." (Letter to Soviet Leaders, London, p. 58)

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পেছনে থাকে জাতির একটি ভাবাদর্শ এবং পরম্পরা। এটিকে আমরা এখানে আপাতত মীথ্ (myth) পারিভাষিক শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করব। এই মীথ জাতির জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে বলে এটিকে না বুঝলে সেই জাতিটিকে বোঝা যায় না। Mircea Eliade-এর ভাষায়, "That is the great function of myth in traditional societies, where myth is something living. It is the keystone of cultural, social and religious life." (Span, April . p. 39)

বিশ্বের প্রতিটি সমাজেই জনসাধারণের মীথগুলি সভ্যতার দিক-পরিবর্তনের সূচনা করেছে। পুরনো মীথের বদলে নতুন মীথ জনসমাজকে কিছুটা অনুপ্রেরণা দিলেও তার ফল স্থায়ী হয়না। গ্রীসের সাহিত্যিকেরা পূর্ববর্তী মীথগুলিকে নতুন রূপ দিলেও গ্রীকসভ্যতা শেষরক্ষা করতে পারেনি। বস্তুত গ্রীস-রোম-ব্যাবিলন-মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হবার অন্যতম প্রধান কারণ সে-দেশগুলির মীথ্ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। মীথ্ হারিয়ে যাওয়ায় সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তর পুরুষেরা পরে আর দাঁড়াতে পারেনি ; বর্তমানে তারা আর পাঁচটি জাতীর মতোই—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে পারছে না।

বিপরীতদিকে ইহুদীও ভারতীয় হিন্দুরা নিজস্ব মীথ কে ধরে রাখতে পেরেছিল বলেই আজও এই দুটি জাতির প্রাণশক্তির স্পন্দন পাওয়া যায়। প্রশ্ন হতে পারে, প্রাচীন মীথ্ ধরে রেখে ইজরায়েল ও ভারত কি প্রগতিশীল হয়েছে? উত্তরে বলা যায়—ভাল-মন্দ যাই হোক, বর্তমান পৃথিবীতে এই দুটি দেশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখতে পেরেছে এবং গ্রীস-রোম-মিশর যেখানে সাধারণ কয়েকটি দেশ হিসেবে আজ পরিগণিত সেখানে ইজরায়েল ও ভারত বিশ্ব-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

গ্রীসের সাহিত্যিকেরা যেমন নতুন মীথ্ আমদানী করেও জাতিকে বাঁচাতে পারেননি, বিংশ শতাব্দীতে হিটলারের আর্য-মীথ্ এবং জিন্নার ইসলাম-মীথের পরিণতিও সে-রকমই। সম্পূর্ণ নতুন মীথ্ প্রথমদিকে জাতিকে কিছুটা অনুপ্রেরণা দিলেও ক্রমে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে কিংবা অন্যান্য মিথের সাথে মিশে গিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারায়। বৌদ্ধযুগে শ্রমণদের প্রচারে তিব্বত-আফগানিস্তানে বৌদ্ধধর্মের নতুন রূপ লাভ এরই পরিণতিতে। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি হলেও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে না, কারণ অন্যান্য শ্রেণীর মতো শ্রমিকদের নিজস্ব মীথ্ গড়ে ওঠেনি। কমিউনিষ্ট মীথ্ এর স্থান কিছুটা নিলেও তাকে লড়াই করতে হচ্ছে অন্যান্য মীথের সাথে। কিউবায় কৃষিভিত্তিক মীথ, ইওরোপে খৃষ্টানী মীথ্, ইরাক ও দক্ষিণ রাশিয়ায় ইসলামী মীথ্ ইত্যাদির সাথে কমিউনিষ্ট মীথ্ কতটা সহযোগিতা কতটা বিরোধিতা করবে সে প্রসঙ্গে মার্কসবাদী পণ্ডিতেরা এখনও সন্দিহান। চীন এই পরীক্ষায় খুবই জড়িয়ে পড়েছে। শত পুষ্প ফুটুক, বৃহৎ লাফ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব, কনফুশিয়াসকে বাতিল করা, চারচক্রের বিচার, এবং বর্তমানে কিছুটা মুক্ত বাতায়নের পরিবেশ তৈরী—এইগুলি চীনা পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়। গত ৩৩ বছরে চীনা শাসকেরা কমিউনিষ্ট মীথ্ থেকে মাও সেতুং-মীথ্ হয়ে জাতীয়তাবাদী মীথের দিকেই শেষ পর্যন্ত যাচ্ছেন কিনা এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার—শ্রমিকদের নিজস্ব মীথ চীনে গড়ে উঠতে পারেনি।

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগ প্রয়োজনে অনেক পরিবর্তন এলেও primary mythic expression-কে একেবারে বাতিল করা হয়নি। বাঙালী বিবাহ প্রথায় যজ্ঞ, সম্প্রদান ও সপ্তপদী অংশ ছাড়া বাকী সবকিছুতেই

বাঙালীর আদি পুরুষদের (অষ্ট্রিক) ক্রিয়াকাণ্ড থেকে গেছে। গায়ে হলুদ, বেতের ঝুড়ি, পান-সুপারী, শ্বশুর বাড়িতে বধূ বরণ, বাসর ঘরের আচার-প্রথা ইত্যাদি আজও বাঙালী জীবনে আদিবাসী সংস্কৃতির ছাপ বহন করে আসছে। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজোয় সংস্কৃত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত চালু থাকলেও প্রতিমা-নিদর্শনে মানবীয় ভাবের প্রকাশ বাঙালীর প্রাইমারী মীথকেই ধরে রেখেছে। শংকরাচার্য অদ্বৈতবাদের প্রচারক হয়েও পঞ্চ উপাসনাকে (শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য, বিষ্ণুর সম্মিলিত পূজো) স্থান দিয়েছিলেন ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই। বিপরীত-দিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম ধর্ম শক্তিহীন হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ এই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে না বোঝা। রবি ঠাকুরের সামনে সমস্যা ছিল—তিনি কি ভারতের লৌকিক পূজা-পার্বনকে হুবহু মেনে নেবেন! তাঁর ব্রহ্ম সংস্কার এ-বিষয়ে একটি বড় বাধা ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি এর একটি সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ, নববর্ষ, বসন্তোৎসব ইত্যাদির মধ্যে এই পরিচয় পাওয়া যায়। লৌকিক পূজা-পার্বণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং ক্রিয়াকাণ্ডের মূল অংশগুলি মেনে নিয়ে তিনি এগুলির কিছুটা নতুন রূপ দিলেন। কিন্তু সেগুলি শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দীতেই আটকে পড়ে রইল, বাংলাদেশ বা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল না। বিপরীতদিকে স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম অনুপ্রাণিত করল অনেক বেশী লোককে। আজ এ-রকম অসংখ্য সংস্থা এবং এগুলির নামে 'সেবা' শব্দটির প্রয়োগ তারই পরিচয় বহন করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ-প্রসঙ্গে নতুন কোন রূপ আমদানী না করে জাতীয় মীথের গভীরে ঢুকে জাতির ভাবাদর্শকে উদ্ধার করলেন স্বকীয় প্রতিভায়। তিনি জানতেন যে নতুন রূপের আমদানীর অর্থ নতুন প্রতীকের আমদানী, এবং যতই নতুন নতুন প্রতীক আনা হোক না কেন, ভাবাদর্শের মূলটিকে উদ্ধার না করলে এই নতুন প্রতীক বহিরঙ্গের সজ্জাবিশেষ হয়ে দাঁড়াবে। Origin and growth of Religion-এ ম্যাক্স মূলারের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"When the Aryan settlers in India had arrived at the conviction that all their Devas or Gods were mere names, we might imagine that they would have turned away in despair and disgust from what for ages they had adored and worshipped. But the result

was totally different from what we should have expected. With the Greeks and Romans and Germans we know that their ancient Gods, when their course was run, disappeared either altogether or if their existence could not be entirely annihilated, they were degraded into evil and mischievous spirits ; while there was at the same time a new religion, namely Christianity, ready at hand, and capable of supplying those cravings of the heart which can never be entirely suppressed...In India there was no such religion coming, as it were, from outside in which Brahmanas after they had lost their old Gods and protectors, could have taken refuge. So instead of turning aside and making a new start, like the Greeks and Romans and Germans, they toiled on their track, trusting that it would lead them right if they fainted not in their search after the what had been presented to their minds from the first awakening of their senses, but what they had never been able to grasp firmly to comprehend or to name."

শ্রীরামকৃষ্ণ রাম-কালী-শিব রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি প্রতীককে বাতিল না করে এদের মূল তাৎপর্য তুলে ধরলেন। কথামৃতের মাষ্টারমশাই যখন কালী প্রতিমাকে 'মাটির' বলে উল্লেখ করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন, "মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।" প্রতিমা প্রতীক। কিসের প্রতীক? মানুষের মৌল চেতনার। এই মৌল চেতনাই প্রতিমাকে ভিন্ন তাৎপর্য দেয়, সাধকের কাছে তাৎপর্য বহন করে আনে। প্রখ্যাত মীথতত্ত্ববিদ Mircea Eliade শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে বলেছেন, It was my Indian experiences that made me truly understand the gesture made by a Greek or Romanian peasant when he kneels and crosses himself before an icon. Before my stay in India, I was rather disturbed by the fetishistic side of such an action, and I thought that 'true religion' was first of all contemplation and meditation, like any Christian who sees himself as an enlightened believer.

But when I saw the extraordinary importance of symbolism for the Indian people, I realized that until then I had very much underestimated the existential scope of symbol and image.

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) রাধাকৃষ্ণের অস্তিত্বের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন: রাধাকৃষ্ণকে না মানিস, তার টানটুকু নে না। Cassirer যেখানে বলেছেন, "It is not with things that man has to do in the mythological process, it is power arising within consciousness itself that move him.... The mythical process deals not only with natural objects but with the pure creative potencies whose original product is consiousness itself. (Philosophy of Symbolic Form, vol. 2, chapter 1.)

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে আপাত দ্বন্দ্ব দেখা যায় তা হল মূলত প্রতীক ও প্রথার দ্বন্দ্ব। মৌলচেতনার বদলে মানুষ যখন প্রতীককে প্রধান করে তোলে তখনই দেখা দেয় নতুন ধর্ম যা সেই মৌলচেতনাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বহু সাধনার মধ্য দিয়ে দেখালেন যে বিভিন্ন প্রতীক ও প্রথার পেছনে কাজ করছে সেই একই মৌলচেতনা। তাঁর 'যত মত তত পথ' উক্তির এটি একটি তাৎপর্য।

ভারতাত্মার মর্মবাণীকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করেছেন অসাধারণ দৃষ্টিতে, এবং সেইসাথেই জাতির সামনে রেখেছেন যুগোপযোগী পথ। মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন এক সিদ্ধান্ত তিনি দিয়ে গিয়েছেন যা ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে বাতিল না করেও নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন নতুন নতুন ধর্ম-আন্দোলনে ভারত তোলপাড়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করে থিওজফিষ্ট সোসাইটি নতুন চিন্তা নিয়ে এসেছে ভারতীয় ধর্মজীবনে, আর সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে আর্যসমাজের আন্দোলন। এঁদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ধর্মের জাগরণ, ভারতীয়দের মনে জাগ্রত চেতনার সঞ্চার।

মনে প্রশ্ন জাগে—এঁদের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য কি?

নব-ভারতের জাগ্রত চেতনায় তাঁর অবদান কি? পূর্বোক্ত মনীষীদের চিন্তায় কি কোন অপূর্ণতা ছিল যার জন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল!

হাঁ, অপূর্ণতা ছিল পূর্বোক্ত মনীষীদের চিন্তায়। রাজা রামমোহন যখন বললেন, একেশ্বরবাদই ভারতীয় ধর্মের আসল রূপ এবং বহু দেবদেবীপ্রথা অনার্য সংস্কৃতির আপজাতোর লক্ষণ, তখন মনে প্রশ্ন জাগে—রামমোহনের এই কল্পিত ভারতে কোল-ভীল-মুণ্ডা-সাঁওতালের স্থান কোথায়? তারা কি প্রকৃত ভারতীয় হবার জন্ত তাদের চাঁদবোঙা-সিংবোঙাকে (চন্দ্র-সূর্য দেবতা) গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে? দয়ানন্দ সরস্বতী যখন আর্য ভারতের কথা তোলেন, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—তাঁর কল্পিত এই ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থান কোথায়? থিওজফিষ্টরা যখন অদৃশ্য মহাত্মা ও গুহ্য রহস্যবিদ্যার কথা প্রচার করেন, তখন মনে প্রশ্ন জাগে—ভারতীয় ধর্মচিন্তায় কি তবে যুক্তিশীলতা, মননশীলতা, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির কোন স্থান নেই?

এর উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, নিজস্ব ধর্মীয় পরিভাষায়। তাঁর বহু সাধনার ধারায় ঐতিহাসিক তাৎপর্যটি ফুটে উঠলো অপরূপভাবে। তিনি দেখালেন যে ভারত বলতে শুধু একেশ্বরবাদ-অদ্বৈতবাদকে নিলেই চলবে না, বুঝতে হবে লোকধর্মগুলিকেও (folk-religions)। এই লোকধর্মগুলির মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে আপামর জনসাধারণের হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা-আশা-কামনা। একেশ্বরবাদের মধ্যে যে ভারত প্রতিফলিত হচ্ছে, সেই ভারতই প্রতিফলিত হচ্ছে সাঁওতালদের মাদলের শব্দে, আদিবাসী মেয়ের টুসু গানে, সন্ধ্যেবেলায় তুলসীগাছের নীচে জ্বেলে-দেওয়া প্রদীপের আলোয়। সেই সাথেই তিনি দেখালেন, ভারত বলতে কেবল আর্য সংস্কৃতিই বোঝায় না, যে দ্রাবিড় সংস্কৃতি যুগ-যুগ ধরে স্বকীয় অবদান রেখে গেছে তাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সমাজের অখণ্ড রূপটির সন্ধান মেলে না। আর কি দেখালেন শ্রীরামকৃষ্ণ? দেখালেন যে শুধু মিষ্টিসিজম্ (mysticism)-ই নয়, ভারতীয় ধর্মে যুক্তি-বিচার-মননশীলতাও রয়েছে। উপনিষদের সেই নির্দেশকে নতুন-ভাবে রূপায়িত হতে দেখলাম আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। প্রথমে শ্রবণ—জানতে হবে সত্য সম্বন্ধে কে কি বলেছে; যুগ-যুগ ধরে মানবচেতনা যে অবদান রেখে গেছে তাকে না জানা ইতিহাস বিরোধী মানসিকতা।

তারপর মনন—যুক্তি দিয়ে বিচার করে এগুলির তাৎপর্য বুঝতে হবে, ব্যক্তিত্বের বিকাশে স্বকীয় সিদ্ধান্তে আসতে হবে। শেষে নিধিধ্যাসন—যে সিদ্ধান্তে এলাম তাকে রূপায়িত করতে হবে নিজের জীবনে, উপলব্ধির প্রদীপ্ত শিখায় প্রোজ্জ্বল করে তুলতে হবে কায়-মন-বাক্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে চিনিয়ে দিলেন প্রকৃত ভারতকে, ঘরছাড়া বালককে চিনিয়ে দিলেন তার মাতৃ-পরিচয়। জাতীয় জীবনের গভীর থেকে উদ্ধার করলেন আত্মসত্তাকে। বললেন, এইসব নিয়েই ভারত। কিন্তু সেখানেই থেমে গেলেন না তিনি। ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের সাধনাও করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, শুধু নিজের ঘরটিকে চিনলেই হবে না, তাকাতে হবে বাইরের দিকেও। কেবল নিজেকে চিনলে মানুষ ঘরকুনো হয়ে পড়ে, কুয়োর ব্যাঙ হয়ে যায়। জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নটির সমাধান দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজস্ব ধর্মীয় পরিভাষায়।

পঞ্চবটীর নীচে দুস্তর তপস্যা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বট-অশ্বত্থ তো শুধু গাছ ই নয়, তাঁর সাধনায় সেই গাছ এক প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। মাটির বহু নীচে সেই গাছ তার শেকড় চালিয়ে দেয় টেনে নেয় প্রাণরস। মানুষকেও তেমনি নিজস্ব ঐতিহ্য উপলব্ধি করতে হয়, জাতীয় জীবন থেকে গ্রহণ করতে হয় প্রাণরস। যে এই প্রাথমিক কাজকে অবহেলা করে তার আন্তর্জাতিকতা-বোধ বায়বীয় আন্তর্জাতিকতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মানুষের root চাই প্রথমে। আবার এই root-ই শেষ কথা নয়, উন্মুক্ত আকাশে গাছকে মেলে দিতে হয় ডালপালা, মাথা তুলতে হয় অসীমের পানে। মানুষকেও তেমনি বিশ্বজনীন হতে হয়, বিশ্বাত্মায় অবগাহন করতে হয়। বিশ্বপথিকে পরিণত হতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের লোকজীবনকে কত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর জীবনচর্যা ও বাণীতে। জীবন যাত্রায় তিনি একান্তভাবে ভারতীয়, সঠিকার্থে বাঙালী। পোশাক-খাদ্য-বাসস্থান-কথাবার্তায় তিনি ঘরোয়া বাঙালী। বাঙালীর সেই সাধারণ পোশাক তাঁর পরণে, খাবার ভাত ডাল মাছের ঝোল, প্রিয় খাবার জিলিপী, কথাবার্তায় হুগলী জেলার টান—কিছুই তিনি পাল্টান নি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মথুরানাথ বিশ্বাসের কথাতেও 'বাবু' সাজতে রাজি হননি, গুরু তোতাপুরীর ব্যঙ্গ সহ্য করেও হাততালি

দিয়ে হরিণাম করেছেন। আর গান গাওয়ার সময় রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণব কীর্তনই তাঁর মুখে শোনা যেত। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাবার সময় উপমা হিসেবে নিয়ে এসেছেন পানা পুকুর, গ্রামের মেয়ের ঢেঁকী চালানো, গামছা-কাঁধে স্নানে যাওয়া, লণ্ঠন-হাতে তামাকের আগুন খোঁজা, মাছের ঝুড়ী নিয়ে মেছুনী, চিল-শকুন-চাতক-ব্যাঙ। একদিকে যিনি একান্তভাবে ঘরোয়া বাঙালী, ভারতীয় লোক জীবনের অংশীদার, অন্তদিকে তিনিই আবার বিশ্ব পথিক—সব ধর্মের মূল উৎস ও লক্ষ্য খোঁজেন। নিজের হাতে বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করে ধর্মগুলিকে পরীক্ষা করে দেখেন—নিজস্ব পরিভাষায় তুলে ধরেন উদার আন্তর্জাতিকতাবোধকে।

ভারতীয় লোকজীবন সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি কত গভীর ছিল সেটি তাঁর একটি উক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়—"মা, আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিস না, আমায় রসে বসে রাখিস।" ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে এই দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ত্যাগ ও আনন্দ এই দুটি ধারা সহগামী। একদিকে যেমন আদিবাসী উপজাতিদের সামাজিক ধর্মীয় উৎসবগুলির মধ্যে নাচ-গানের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়, অন্তদিকে উপনিষদের ঋষিরাও ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়ে 'রসো বৈ সঃ' এবং 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' বাক্যের প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধদেব জীবনের দুঃখটাকেই বড় করে দেখেছিলেন, কিন্তু উপনিষদে বলা হয়েছে "আনন্দের মধ্যেই জীব জন্মগ্রহণ করে, আনন্দের মধ্যেই বেঁচে থাকে, আবার আনন্দের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে।" সামাজিক জীবনেও সিন্ধু সভ্যতা থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যে কিংবা বোর্নিয়ের ও হিউয়েন সাংয়ের বিবরণীতে সাধারণ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যই চোখে পড়ে। বিদেশে মণিমুক্তো-মশলা রেশম ইত্যাদি রপ্তানীতেও ভারতীয়দের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটা বোঝা যায়। সেই সাথে ত্যাগ, সংযম ইত্যাদির ধারাও চলে এসেছে যুগ-যুগ ধরে। হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর ভগ্নাবশেষ থেকে যেমন যতিমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, তেমনি বৈদিক যুগ হয়ে গুপ্তসম্রাজ্য এমন কি মধ্য যুগীয় ভারতেও সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম ছিল না। ত্যাগ ও আনন্দের দুটি ধারা বহুকাল ধরে সহগামী বলে এই দুইয়ের মিলনেই ভারতীয় সংস্কৃতির বা লোকজীবনের সঠিক রূপটি পাওয়া যায়। চার্বাক এ-দেশের মানুষের মনে স্থায়ী স্থান পাননি, কারণ তিনি ত্যাগবিহীন আনন্দের কথা বলেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সে রকম আনন্দবিহীন

ত্যাগের কথা প্রচার করায় এদেশে স্থায়ী স্থান পায়নি। বুদ্ধদেব নির্বাণকেই আদর্শ করে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণেরা কি সে-কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পেরেছিলেন? বৌদ্ধ স্তূপ ও গুহাগুলিতে যে অপূর্ব ছন্দময় শিল্পের চিহ্ন রেখে গিয়েছেন বৌদ্ধ শ্রমণেরা তাতে কি এটাই বোঝায় না যে ভারতীয়রা ত্যাগ ও আনন্দের মিলনেই বেশি আস্থাশীল! খাজুরাহো-কোণার্ক-পুরীর মন্দিরগাত্রে যে বিচিত্র মিথুন মূর্তি আঁকা রয়েছে, সেগুলি দেখে যারা ভ্রূকুঞ্চিত করেন তারা ভুলে যান যে ভারতীয়রা মূলত দুঃখবাদী নয়। ইসলামে সঙ্গীত নিষিদ্ধ (কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া) কিন্তু ভারতীয় মুসলমানেরা কি তা মেনে নিতে পেরেছেন কোনদিন? তানসেন থেকে শুরু করে বড়ে গোলাম আলী, বিলায়েৎ খান, আল্লা রাখা, এমন কি পাকিস্তানের নূরজাহান কোন্ পথের পথিক? মুসলমান সম্রাট ও নবাবেরা কি যথেষ্ট পরিমাণে নাচ-গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি? ব্রাহ্ম সমাজের কঠোর নীতিবাদকে অগ্রাহ্য করে রবিঠাকুর নাচ-গান-কবিতা-নাটকে সেই সুন্দরেরই খোঁজ করেছেন, আনন্দের সন্ধান করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারা রবি ঠাকুরের প্রবল বিরোধী ছিলেন কারণ তাঁদের অভিযোগ ছিল রবি ঠাকুর স্টেজে 'নারীনৃত্য' করান। পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসেবে রবি ঠাকুরকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ব্রাহ্মনেতারা প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। (সোশ্যাল ফ্রেটারনিটি ও সীতা দেবী—অধ্যাপক সুশোভন সরকার, দেশ ৩১-৫-১৯৭১)। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছিলেন "মা আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিস না। আমায় রসেবসে রাখিস", তখন তিনি ভারতীয় লোকজীবনের মূল সুরটিকে বহন করে এসেছিলেন। চার্বাক-সুলভ আনন্দ নয়, বুদ্ধের দুঃখবাদ নয়, ত্যাগের মহিমায় মণ্ডিত আনন্দকে জীবনের সঙ্গী করে তোলাই তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মনোবিজ্ঞান ও মীথ,

ফ্রয়েডের শিষ্য প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ইয়ুং-এর মতে জাতির মৌলচেতনা ও প্রতীক কাঠামোকে বাদ দিলে জাতির জীবনে neurosis দেখা দেয়: নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাঠামোয় পরিবর্তন আনা দরকার, কিন্তু প্রাচীন মীথকে না বুঝে বাতিল করে দিলে জাতির জীবনে rootless consciousness দেখা দেয় এবং এর ফলে psychic epidemic জাতিকে গ্রাস করে। The

psychology of the child Archetype-এ তিনি লিখেছেন, "In reality we can never legitimately cut loose from our archetypal foundations unless we are prepared to pay the price of a neurosis, any more than we can rid ourselves of our body and its organs without committing suicide. If we cannot deny the archetypes or otherwise neutralize them, we are confronted, at every new stage in the differentiation of consciousness to which civilization attains, with the task of finding a new interpretation appropriate to this stage, in order to connect the life of the past that still exists in us with the life of the present, which threatens to slip away from it. If this link up does not take place, a kind of rootless consciousness comes into being." প্রাচীন গ্রীক রোম-ব্যাবিলন-মিশরের উদাহরণ দিয়ে এ-কথাটা আমরা আগেই বুঝিয়েছি। একটি জাতি যখন অন্য জাতির সংস্কৃতির মুখোমুখি হয় তখন শুধু সংস্কৃতি-করণই (acculturation) ঘটে না, উদ্ভব ঘটে প্রান্তিক ব্যক্তিত্বের (marginal personality)। এ বিষয়ে রবার্ট পার্ক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বুলবুল ওসমান এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির আর একটি নতুন ধারা আজকাল সংস্কৃতিতত্ত্বে বেশ জায়গা করে নিয়েছে। এই ধারা হল 'প্রান্তিক ব্যক্তিত্ব' বা মার্জিন্যাল পার্সোন্যালিটি। এই প্রান্তিক ব্যক্তিত্ব কি ? দুটি সাংস্কৃতিক দল যখন পাশপাশি থাকে তাদের মধ্যে সংখ্যা-লঘুরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। তখন বৃহত্তর দলের সংস্কৃতি তাদের মধ্যে কিছুটা প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এই প্রান্তিক ব্যক্তিত্বে সংকটটা ফুটে ওঠে বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মে। তারা ক্ষুদ্র দলের কিছু গ্রহণ করেছে আবার গ্রহণ করেছে বৃহত্তর দলেরও, তখন নিজ দলেই তাদের সংঘর্ষ লেগে যায়। তখন এরা না বৃহত্তর দলে ভালোভাবে স্থান পায়, না স্থান পায় সংখ্যালঘু দলে। এদের সাংস্কৃতিক সহযোগে বেশ অসুবিধা হয়। এরা পৃথক হয়ে পড়ে এবং দুই দলের সংস্কৃতির 'প্রান্ত' ছুঁয়ে থাকে বলে এদের বলা হয় প্রান্তিক ব্যক্তিত্ব।... এই উপমহাদেশে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা এর অন্যতম উদাহরণ। তারা না ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেদের ভাবতে পারে, না পারে ইংরেজদের গ্রহণ করতে। বাংলাদেশে

বিহারীদের দ্বিতীয় প্রজন্মে এই সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রচুর।”

বৃটিশ-শাসনে ভারতীয়দের জীবনে এ-ধরণের সংকট দেখা দিয়েছিল। নব-জাগরণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্যায়ে এই সংকট সম্বন্ধে আলোচনা করছি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ঘোষের মন্তব্য : রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে দেখিয়েছেন জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির গভীরে সত্তার শিকড় মেলে দিয়েই একজন খাঁটি জীবন্ত প্রাণবান মানুষ হওয়া যায়—এবং উদার বিশ্বজনীন মানুষ হওয়ারও এটাই উপায়।…বাংলার কয়েক হাজার বছর যাবত মানুষ যত কথা ভেবেছে, যত স্বপ্ন দেখেছে, যত সাধনা করেছে, যত অনুভূতি-উপলব্ধি লাভ করেছে কোনো কিছু অগ্রাহ্য করেননি রামকৃষ্ণ, অঙ্গীকৃত ও সমন্বিত করতে চেয়েছেন নিজের জীবনে। অথচ বিশ্বের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ ছিল না; ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও নয়, ইসলাম বা আর্য বেদ-উপনিষদের সঙ্গেও নয়। তাঁর পথ বিরোধ-বিদ্বেষেব ও জাতিগর্বের পথ নয়—তিনি গ্রহণ ও সমন্বয়ের, মিলন ও আত্মীয়তার পথের পথিক।…ইংরেজের উপনিবেশে বাংলায় সম্পূর্ণ স্বাধীন চিত্তের মানুষ ছিলেন রামকৃষ্ণ।…(লোকায়ত শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৮-৯)। ডঃ ইয়ুংয়ের কথায় ফেরা যাক শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বিখ্যাত উক্তি : নবাবী আমলের টাকা এ-যুগে চলেনা! অর্থাৎ, সেই টাকার currency value নেই (যদিও gold value আছে)। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বহু চিন্তাশীল মানুষ এই কারেন্সী ভ্যালুকে বাদ দিতে গিয়ে গোল্ড-ভ্যালুকেও বাদ দিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। অথচ এই গোল্ড-ভ্যালু যাকে আমরা মানবচেতনা ও প্রতীকের মৌল কাঠামো বলেছি, সেই মৌল কাঠামোকে বাদ দিলে জাতির জীবনে neurosis বা psychic epidemic দেখা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই original past বা primary myth-কে বাতিল করে দিলেন না। রাম-শিব-কালী উপাসনার মাধ্যমে তিনি নিজস্ব ধর্মীয় পরিভাষায় সে-কথাই বললেন। আবার তিনি যখন কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রমুখ আধুনিক মানুষদের সাথে দেখা করতে উৎসাহিত হন তখন সন্দেহ নেই যে তিনি আধুনিক চিন্তাধারাকেও অস্বীকার করেন নি। দয়ানন্দ সরস্বতী original past-এর ওপর জোর দিতে গিয়ে আধুনিক চিন্তাধারাকে অস্বীকার করে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তা করেননি। প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ যখন বারবার ‘শুকদেবের মতো নির্বিকল্প সমাধি’ চেয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ততবারই তাকে

লোকশিক্ষার কথা বলেছেন, Social commitment-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কার্যকলাপে পার্থক্য থাকলেও basic urge-এ বিশেষ পার্থক্য নেই। রূপকথা-অরণ্যদেব-টার্জান প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মনকেও টানে ; প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের মনে অতীতের প্রতি একটা আকর্ষণ দেখা যায় যাকে অনেকসময় nostalgia বলে অভিহিত করা হয়। প্রাচীনযুগের alchemist-দের basic urge এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিবিদদের basic urge-এও পার্থক্য নেই। দুইয়েরই উদ্দেশ্য, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে পূর্ণতাপ্রাপ্তি। বিজ্ঞানের অন্য একটি দিকেও এই সাদৃশ্য দেখা যায়। পরমাণু বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার বলেছেন, "The general notion about human understanding...which are illustrated by discoveries in atomic physics are not in the nature of things unheard or new. Even in our own culture they have a history, and in Buddhist and Hindu thought a more considerable and central places. What we shall find is an exemplification, an encouragement and a refinement of old wisdom." (Science and the Common Understanding, p. 8-9)।

বৈজ্ঞানিকদের পরে এবারে মার্কসবাদী দার্শনিকদের দিকে তাকালে আমরা দেখি, তারা ভবিষ্যতের কমিউনিস্ট সমাজে যে বন্ধন মুক্তির কল্পনা করেছেন, আদিমযুগের সমাজকেও তেমনি বর্ণনা করেছেন Primitive Communism নামে। পাশ্চাত্যের হিপি-আন্দোলন প্রসঙ্গে Mircea Eliade মন্তব্য করেছেন, "I have had the opportunity...to observe the 'hippie movement' at close range and to follow its effects among my own students in Chicago. Well, with the hippies it is quite clear that they have rediscovered something which had been thought of as lost since the days of prophets : 'Cosmic religiosity' ! And at the same time the meaning of life as a sacramental epiphany, as something more precious than it was for their parents.

মানুষের মতো জাতির জীবনেও এটি দেখা যায়। যেমন নিজস্ব প্রাচীন

সংস্কৃতি জাতীয়তাবোধে একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষের বা জাতির জীবনে সেই গভীর আকুতিটি কি? এ-প্রসঙ্গে জাঁ পল সার্ত্রের কথা শোনা যাক—"পারিবারিক সম্পর্কটাই অন্যান্য সম্পর্কের তুলনায় প্রাথমিক।...একভাবে, সকলকে নিয়ে একটাই পরিবার।...প্রত্যেকের পক্ষে জন্মটা তার প্রতিবেশীর জন্মের মতো এমনই একরকম ঘটনা যে, এই ব্যাপারটার কারণে দুজন লোক যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তারা এক অর্থে একই মায়ের সন্তান। অবশ্য পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ লব্ধ (empirical) মা এ নয়, তার চোখ নেই, তার মুখ নেই, এ একটা আইডিয়া যা আমাদের দুজনের আপন, যেমন অন্য যে-কারো। একই জাতির প্রাণী হওয়া একভাবে একই বাপমায়ের সন্তান হওয়া। আমরা সেই অর্থে সকলেই ভ্রাতা। এই ভাবেই কিন্তু লোকে মানবজাতির সংজ্ঞা দেয়। হাজার হাজার বছর আগে প্রথম যে সামাজিক বিভাগ হয়েছিল তা হল বর্গ (clan) যা তার টোটেম দ্বারা চিহ্নিত। সেটা ছিল এমন কিছু যা সমগ্র বর্গকে আবেষ্টন করে থাকত এবং বর্গের সমস্ত সদস্যকে পরস্পরের সম্পর্ক বিষয়ে এক গভীর বাস্তবতা দিত...। বর্গের বিশাল কল্পনা, তার গর্ভগত ঐক্য...ওটাই আজ আবার খুঁজে পেতে হবে, কেননা তাই ছিল এক সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব। তা অবশ্য এক অর্থে মিথ ছিল, কিন্তু তা এক বাস্তবও ছিল।...প্রতিবেশির সঙ্গে যে-সম্পর্ক তাকে বলা হয় ভ্রাতৃত্ব, কারণ তারা অনুভব করে তাদের একই উৎপত্তি। তাদের একই উৎপত্তি এবং ভবিষ্যতে একই অবসান, এ দিয়েই তো ভ্রাতৃত্ব গড়া।" (পূর্বোক্ত 'সংলাপ', পৃঃ ৩৭-৩৮, ৪০)

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁর সাধনায় বাৎসল্য ও মাতৃভাবের ওপর জোর দেন তখন বোঝা যায় যে তিনি শুধু বাঙালী বা ভারতীয়দের নয়, সমগ্র মানবজাতির মৌল আকুতির কাঠামোটিকে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি অদ্বৈত-অনুভূতিকে শেষ কথা বলেছেন, বলেছেন: "কালী কালো কেন? দূরে বলে। কাছে যাও, কোন রঙ নেই।" এ-সত্ত্বেও তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত এই মাতৃত্বকে ছাড়েননি, কারণ তিনি নিজে প্রতীকের ব্যবহার ছাড়িয়ে মৌল-চেতনাকে ধরতে পারলেও বুঝেছিলেন যে সাধারণ মানুষ তার চেতনার মৌল কাঠামোকে বাদ দিয়ে এগোতে পারে না। বস্তুত বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবের মধ্যে মাতৃভাবকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে তিনি মানুষের গভীর আকুতিকে রূপ দিয়েছিলেন, চেষ্টা করেছিলেন সমস্ত প্রতীক ও প্রথাকে সেগুলির প্রকৃত স্থানে

তুলে ধরতে। তিনি জানতেন যে এগুলিকে বাদ দিয়ে কোন জাতি এগোতে পারবে না। অদ্বৈত উপলব্ধির পরও তিনি শিব-কালী-বিষ্ণু ইত্যাদি প্রতীককে ত্যাগ করেননি, এটা তার জীবনের কোনও কণ্ট্রাডিকশন নয়, বরং গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয়, যে-প্রজ্ঞাদৃষ্টি কোন খণ্ডরূপকে না নিযে অখণ্ডভাবে বা সামগ্রিকভাবে মানবচেতনাকে বুঝতে চেষ্টা করে।

অবতারত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ

যে-শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন গুরু-কর্তা-বাবা শব্দগুলিতে তাঁর গাযে কাঁটা ফোটে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অবতারত্ব ঘোষণা করেছিলেন কেন?

প্রশ্নের উত্তরটি খোঁজার আগে রবিঠাকুরের প্রাসঙ্গিক চিন্তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সমাজে দুটি নতুন মীথ গড়ে উঠেছে—একটি হল, বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অনন্ত উন্নতি সম্ভব; আরেকটি, শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন কমিউনিষ্ট সমাজে মানুষ পরম শান্তিতে থাকবে। প্রযুক্তিগত (technological) এবং মার্কসবাদী মীথের পজিটিভ্ দিকগুলিকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেও শেষপর্যন্ত এই দুটি মীথের ওপর ভরসা রাখতে পারেননি। বিজ্ঞানের ফলে আমরা গতিকে পেয়েছি, কিন্তু হারিয়েছি গতির আনন্দকে—তাঁর এই মন্তব্যের মধ্যেই প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়, আর 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাওয়া যায় দ্বিতীয়টির পরিচয়। কিন্তু মীথ্ ছাড়া তো মানুষ বিশেষত সাধারণ মানুষ এগোতে পারে না! রক্ত-করবী'র রঞ্জন, ডাকঘর-এ রাজার চিঠি, চিত্রা'র চন্দ্রলোক, মুক্তধারা'য় সুমনের মা এই মীথ্ বা symbol হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই symbol খুঁজে পেয়েছেন, তিনি চেয়েছেন ব্রাহ্মণকে। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ? পুরোহিতরূপী বা বহু-বিবাহকারী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় নয়! ব্রাহ্মণ আদর্শের নিষ্ঠা তেজ, পৌরুষ তাঁকে টেনেছে। গোরা চরিত্রে তারই হদিশ পাই আমরা। এই উপন্যাসের সমাপ্তি কিভাবে ঘটাবেন সে-বিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল। তিনি কি ব্রাহ্মণ-চরিত্রকে যুগোপযোগী করে তুলবেন সামান্য পরিবর্তন করে? গোরার অসম্পূর্ণ কাহিনী তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এর শেষ কোথায়? নিবেদিতা বলেছিলেন, গোরা ও সুচরিতার মিলন ঘটাতে। রবিঠাকুরের মনে যে চিন্তা চলছিল নিবেদিতার কথায় তার সমর্থন পেয়ে আদর্শটি ঠিক হয়ে গেল। তাঁর বিভিন্ন বইয়ে 'ঠাকুরদাদা' চরিত্রটি তাই

বারবার ঘুরে এসেছে। তাঁর আদর্শ ব্রাহ্মণ তাই একদিকে প্রাজ্ঞ, ধীর-স্থির, অন্যদিকে পৌরুষ বলে বলীয়ান এবং নতুন যুগ সম্বন্ধে সচেতন। বেকেটের 'গোডো' বা আয়নেস্কোর 'গণ্ডারে'র মতো রবিঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ' তাই শেষপর্যন্ত বিমূর্ত নয়, যৌক্তিক (rational)। এবং এই তাগিদেই তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠেছে শিব চরিত্র যিনি একদিকে ধ্যান সমাহিত, প্রাজ্ঞ, অন্যদিকে নটরাজ, প্রলয়ের দেবতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন যে এই আদর্শ কেবল যৌক্তিক হলেই চলবে না, হওয়া চাই বাস্তব। সাধারণ মানুষের চোখের সামনে যতক্ষণ না সেই আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে ততক্ষণ সে কেবল যুক্তির ওপর ভিত্তি করে একে গ্রহণ করতে পারবেনা। এ-প্রসঙ্গে আনন্দ লিখেছেন, "From great lives only we get great ideas and examples, values and morals. Principles do not hang in the air as such. And how can it be that only once upon a time there were a few great men born and to them only these were made available ! He (Swami Vivekananda) said himself and he knew how t is great truth of life is being carried, rather relayed, always at all periods of history. Naturally for him mythology was not a static state of the past that is already by-gone. He was face to face himself with this dynamic content of mythology itself in the life of his hero and the master, Sri Ramakrishna. (পূর্বোক্ত Myth Symbol Language, পৃ: ১৮৪-৫)

আদর্শের এই বাস্তব রূপ দেখাবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ এক বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে গেলেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও স্ত্রীকে ত্যাগ না করে গৃহীর মতো রইলেন, আবার গৃহী হয়েও টাকা ছুঁতে পারতেন না এবং সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখান। আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সন্ন্যাসীর রূপায়ন তিনি নিজের জীবনে দেখান, মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন সম্ভব। আধ্যাত্মিকতা ও সংযমের পরাকাষ্ঠায় তিনি যে আদর্শ সন্ন্যাসী এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, তিনি যখন ছেলে-মেয়ে মানুষ করেন নি তখন তাঁকে কি করে আদর্শ গৃহী বলব ? ছেলে-মেয়ের জন্ম দিলেই একজন বাবা হয় না, প্রকৃত পিতৃত্বের পরিচয় সন্তান মানুষ

করার মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাঁরা এসেছিলেন সেই নরেন-রাখাল-বাবুরাম-হরি-যোগীন প্রমুখ শিষ্য, যাঁদের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ-বা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, কেউ বিজ্ঞানের, আবার কেউ দর্শনের, তাঁদের জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলা, তাঁদের সবরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করে নতুনভাবে তাঁদের জীবনকে গড়ে তোলা, গিরিশ ঘোষ নটীবিনোদিনী দানা কালী প্রমুখ মানুষের কাছে জীবনকে অর্থবহ করে তোলার মধ্যেই প্রমাণিত হয় এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষতা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন নরেন্দ্রনাথের মতো তীক্ষ্ণ মেধাবী পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছাত্র, অন্যদিকে ছিলেন লাটুর মতো নিরক্ষর বিহারী গৃহভৃত্য। সবরকম মানুষকে নিজের কাছে টেনে তাদের নতুন মানুষ করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সেই সাথে স্বীয় সহধর্মিনী সারদা দেবীকে শিখিয়েছিলেন গৃহবধূর নিত্যকর্ম—মানুষের সাথে কিভাবে মিশতে হয় তা থেকে প্রদীপের সলতে তৈরী শেখানো পর্যন্ত।

কিন্তু কেন শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ গৃহী ও আদর্শ সন্ন্যাসীর জীবন একাধারে পালন করেছিলেন? তিনি যদি শুধু আদর্শ গৃহী হতেন তবে সন্ন্যাসীরা তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হতেন না; বিপরীত দিকে তিনি যদি শুধু সন্ন্যাসী হতেন তবে গৃহীরা তাঁকে অনুসরণ করার চেয়ে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত হতেন। শ্রীচৈতন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে বৈষ্ণবেরা শুধু শ্রীচৈতন্যের কথা না বলে গৌর-নিতাইকে গ্রহণ করেন (নিতাই বা নিত্যানন্দ বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন)। যে আদর্শ—যাকে আমরা mythic ideal বলেও অভিহিত করতে পারি, যদিও এই আদর্শ মীথলজির পর্যায় ছাড়িয়ে বাস্তব হয়ে উঠেছে—মানুষের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন, সেই আদর্শ যা ঐতিহ্যকে আধুনিক করে তোলে, তাকে তুলে ধরার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হিসেবে আবির্ভূত হলেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্বীয় সহধর্মিনী সারদা দেবী ও প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে মানুষের সামনে রেখে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ এই ত্রয়ীর মধ্য দিয়ে আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপ দেখালেন তিনি মানুষের সামনে। এ-জন্যই তিনি অবতার। এই অবতার প্রসঙ্গে Cassirer লিখেছেন, "The incarnation of God [is] a process which operates continuously in human consciousness." (পূর্বোক্ত

Philosophy of Symbolic Forms, vol. 2, p. 249)।

মৌলচেতনা, সত্য ও বাস্তবায়ন

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, মৌলচেতনাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে মানুষ প্রতীকের ব্যবহার করেছে এবং এভাবেই লোকচেতনার সৃষ্টি হয়েছে। সেইসাথে আমরা এটিও দেখেছি যে এই মৌলচেতনা ও সত্য পৃথক বস্তু নয়, সত্য বা সত্তাই মৌলচেতনার প্রতিভাত হয়ে এই দৃশ্যমান জগতে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে মানুষের নানান ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে। এই সত্য বা সত্তাকে জানা বা উপলব্ধি করার যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে আমরা ভাগ করতে পারি (দ্রষ্টব্য রুথ বেনেডিক্ট্ লিখিত Pattern of Culture বইটি)—Dionysian approach that seeks to attain the most valued moments escape from the boundaries imposed upon him by his five senses ; the Apollonian distrusts all this, he keeps the middle of the road, stays within the known map—অর্থাৎ ডায়োনেশিয়ান পথে রয়েছে প্রচলিত জীবনধারাকে অস্বীকার করে নিজস্ব পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা , এবং অ্যাপোলোনিযান পথে স্বীকৃত হয়েছে মধ্যপন্থা,জীবনধারাকে স্বীকার করে নিয়ে সত্য বা সত্তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা। উত্তর আমেরিকার উপজাতিদের মধ্যে বা গ্রীক ট্রাজেডীর মধ্যে যে এই দুই পথের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি ভারতীয় ধর্মচিন্তায়ও পাওয়া যায়। ইতি-ইতি এবং নেতি-নেতি এই দুই পথের কথা এখানে মনে পড়ে। প্রথমটিকে ভক্তির পথ (Apollonian approach) এবং দ্বিতীয়টিকে জ্ঞানের পথের (Dionysian approach) সাথে এক বলে ধরা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় দেখি যে এই দুই পথেই তিনি সাধনা করে এগুলিকে পরীক্ষা করেছেন এগুলি যথার্থ ই সত্য-উপলব্ধিতে সহায়ক কিনা।

কিন্তু প্রসঙ্গটিকে আমরা অন্য দিক থেকেও আলোচনা করতে পারি। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণে আমরা দুটি পথ দেখি—প্রথমত, authority মেনে সত্য জানার চেষ্টা ; এবং দ্বিতীয়ত, authority না মেনে স্বাধীনভাবে সত্যকে জানার চেষ্টা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাকালের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে তাঁর বার বছর সময়ব্যাপী সাধনার প্রথম চার বছর তিনি স্বাধীনভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন। যদিও কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন, তবুও দীক্ষার পর

গুরুর সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। টাকা মাটি মাটি-টাকা বলে দুই-ই গঙ্গার জলে বিসর্জন দেওয়া, পৈতে ফেলে দিয়ে ধ্যান করা ইত্যাদি সাধনা শাস্ত্রে পাওয়া যায় না ; এ সব তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। এবং এভাবে স্ব-উদ্ভাবিত পথে সিদ্ধিলাভ করে তিনি দেখালেন যে authority না মেনে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করলেও সত্যলাভ হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি সাধনা করেছেন বিভিন্ন গুরুর (তোতাপুরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রমুখ) কাছে থেকে তাঁদের ও শাস্ত্রের নির্দেশে। ঐসব পথেও তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। এভাবে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পথে তিনি দেখালেন যে authority মেনে এবং না মেনে দুই পথেই সিদ্ধিলাভ করা যায়। যে-পথেই যাওয়া যাক না কেন একটি জিনিস অত্যাবশ্যক—সত্য উপলব্ধির জন্য আন্তরিক প্রয়াস ; বহুবার তিনি বলেছেন "ব্যাকুলতা চাই"। কিন্তু শুধু হিন্দুধর্মের সাধনাতেই তিনি তৃপ্ত থাকলেন না, যেহেতু সামগ্রিকভাবে মানবচেতনা ও লোকচেতনাকে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। অ-হিন্দু ধর্মগুলির মধ্যে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের কথাই ধরা যাক, যে দুটি পথে তিনি সাধনা করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের সাধনা করার সময় তিনি মুসলমান গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং ইসলাম শাস্ত্র অনুযায়ী সাধনা করেছিলেন। অর্থাৎ authority মেনে তিনি দেখালেন যে এ-পথেও সত্যলাভ হয়। আবার খৃষ্টধর্মে সাধনার সময় তিনি baptized হন নি, কোন খৃষ্টান পাত্রীর কাছে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন নি। খৃষ্টীয় শাস্ত্রের পথ অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে খৃষ্টের উপাসনা করেছিলেন। এবং এভাবেই সত্য লাভ করেছিলেন অর্থাৎ সত্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বত্রই যে এই দুটি পথ রয়েছে এবং মানুষের আন্তরিকতা থাকলে সে যে-কোন পথেই সত্যকে লাভ করতে পারে —এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় পরিভাষায় প্রকাশ করলেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত মানুষের যে কর্মকাণ্ড দেখা গেছে তাকে অস্বীকার করলেন না তিনি, বরং অপূর্ব প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সেগুলিকে পরীক্ষা করে তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলেন।

সপ্তম অধ্যায় ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

ধর্ম ও সোস্যাল কমিটমেণ্ট

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমাজসেবার আদর্শে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-ভজন ও ব্যক্তিগত মুক্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন, বিপরীতদিকে স্বামীজী পাশ্চাত্যের খৃষ্টান মিশনারীদের অনুসরণে ভারতে এই কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন করেছিলেন।

এই ধরণের মন্তব্যে সার নেই। প্রথমত, সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের সমাজসেবার আদর্শটি পাশ্চাত্য নয়। ইতিহাসে ভারতবর্ষই এই দৃষ্টান্ত প্রথম তুলে ধরে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীরা যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করে সমাজসেবার পত্তন করেছিলেন, তার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে আগে দেখা যায়নি। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান মিশনারীরা এরই অনুসরণ করেছিলেন। স্বামীজী সেই প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকেই নতুনভাবে জীবনদান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, যারা বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কাজকর্মের বা সেবাকর্মের বিরোধী ছিলেন, তারা তাঁর জীবনচর্চা গভীরভাবে অনুধাবন করেননি। তরুণ নরেন্দ্রনাথকে যখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেয় "তুই কি চাস?" নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিলেন—"শুকদেবের মতো নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন, "এত স্বার্থপর তুই!" বস্তুত নরেন্দ্রনাথকে তিনি বারবার বলেছেন লোকশিক্ষা দেবার কথা। নরেন্দ্র রাজি হননি, বলেছিলেন "পারব না।" শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে বলেছিলেন "পারবি না কি রে! তোর ঘাড় করবে।" নরেন্দ্রনাথ কোনদিনই লোক-শিক্ষা বা সমাজসেবায় ব্রতী হতে চাননি; কিন্তু তাঁর গুরু তাঁকে ছাড়েন নি, বারবার উদ্বুদ্ধ করেছেন এই কাজে। কাশীপুরের শেষ শয্যায় নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলেন, "নরেন শিক্ষে দিবে যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরীমা—১৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে একা-একা হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করেছেন, সারা ভারত পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, "অনেক তপস্যা করেছিস, এবারে এই শক্তিকে মেয়েদের সেবায়

লাগা। এই দেশে মেয়েদের বড় দুর্দশা। তুই এদের শিক্ষার ব্যবস্থা কর।" শুধু নরেন্দ্রনাথ ও গৌরীমাকেই নয়, নিজের সহধর্মিনীকেও শ্রীরামকৃষ্ণ কাজে নামাতে চেয়েছিলেন। কাশীপুরে মা-সারদাকে তিনি একদিন অনুযোগ করে বলেছিলেন, "শুধু আমি একাই করে যাব, তুমি কিছু করবে না?" মা-সারদা সঙ্কুচিত হয়ে বলেছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ। আমি কি করতে পারি!" শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর—"না না, আমি আর কি করেছি! তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে হবে।···লোকগুলি অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্ করছে। তুমি ওদের একটু দেখ।" আর গিরিশ ঘোষ যখন প্রবল ধর্মভাবের অনুপ্রেরণায় অভিনয় জগৎ থেকে বিদায় নেবেন ঠিক করেছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে বলেছিলেন, "নাটক বন্ধ করোনা। ওতে লোকশিক্ষা হচ্ছে।" স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারত-প্রব্রজ্যায় রত তখনই দেখা হয় তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্য শরৎচন্দ্র গুপ্তের (পরবর্তীকালে স্বামী সদানন্দ) সাথে। তাঁকে স্বামীজী বলেন, "দেখ বাবা, আমার গুরু (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমাকে একটি কাজের ভার দিয়ে গিয়েছেন। তিনি দুইটি সমস্যার কথা বলে গেছেন—একটি আধ্যাত্মিক অবক্ষয়, অন্যটি মানুষের দারিদ্র্য। এই দুটির নিরাকরণে কাজ করার দায়িত্ব তিনি আমায় দিয়েছেন। এ না করা পর্যন্ত আমার ছুটি নেই।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে দেখা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ দুই ধরণের পরমহংসের কথা বলেছেন—জ্ঞানী পরমহংস ও প্রেমী পরমহংস—তাঁর ভাষায়—"আপ্তসারা," "আম খেয়ে মুখ মুছে নেয়," অর্থাৎ তাঁরা শুধু নিজের মুক্তির কথাই ভাবেন। আর প্রেমী পরমহংস অন্য মানুষদের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা "বাহাদুরী কাঠ" বা "কলের জাহাজ"—নিজেও পার হয়ে যান, সেইসাথে অন্যদেরও পার করে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তুলনামূলকভাবে প্রেমী পরমহংসকে উঁচু স্থান দিয়েছেন। আবার বলেছেন, "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান"—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান, আর সেই উপলব্ধির পর সমাধি থেকে নেমে এসে সবার মাঝে ঈশ্বরকে দেখার নাম বিজ্ঞান।

কথামৃতের বিভিন্ন উক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়, ধর্মচর্চা ও সোস্যাল কমিটমেন্টের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। আর সেজন্যই তাঁর উপাস্য ছিলেন মা ভবতারিণী। নীচে শিব শায়িত, আর তাঁরই ওপরে অধিষ্ঠিতা মা কালী। শুধু মা কালীর দুর্দমনীয় ছবি থাকলে

তা হবে অসম্পূর্ণ, সঙ্গে চাই মহাধ্যানী শিবকেও। শক্তি ও প্রজ্ঞার মিলনই যথার্থ উপায়। বর্তমান যুগে মানুষ শক্তির অধিকারী হয়েছে বিজ্ঞানের সাহায্যে, কিন্তু প্রজ্ঞার যথার্থ উন্মেষ না ঘটায় নবলব্ধ সেই শক্তি মানুষকে শান্তি দিতে পারছে না, মানুষের ভবিষ্যতকে করে তুলছে অনিশ্চিত। আবার শুধু প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের কোন অর্থ নেই যদি তা সমাজে কার্যকর কোন পন্থায় মানুষকে উৎসাহিত না করে। নির্ভেজাল ভালমানুষীর কোন অর্থ নেই যদি তা সমাজে ক্রিয়াশীল ভূমিকা না নেয়। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী-মন্দিরের মহাতাপস মানুষকে সে কথাই বলে গেলেন। প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ 'শুকদেবের মতো নির্বিকল্প সমাধি' চাইলে তীব্র তিরস্কারে তাকে মনে করিয়ে দেন লোক-শিক্ষার কথা। সোস্যাল কমিটমেন্টের মাধ্যমে তিনি ধর্মকে বাস্তবায়িত করে তুলতে বলেছেন, প্রশংসা করেছেন সেইসব প্রেমী পরমহংসদের যারা আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলেন না, পাঁচিলের ওপারে আনন্দের রাজ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ে যারা মানুষকে ডেকে আনেন পাঁচিলের ওপারের রাজ্যের খবর দিতে, যারা কুঁয়ো খুঁড়ে ঝুড়ি-কোদাল ফেলে না দিয়ে সেগুলি তুলে রাখেন অন্যের কাজে লাগবে বলে। ধর্ম ও সোসাল কমিটমেন্টের মিলন ঘটিয়ে, শক্তি ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এক নতুন দিগন্ত তুলে ধরেছেন আজকের মানুষের কাছে।

জীবনের দুটি পর্বে তাঁর হৃদয় থেকে গভীর ক্রন্দন উৎসারিত হয়ে এসেছিল। প্রথম পর্বে তিনি কেঁদেছিলেন ঈশ্বরের জন্য—'মা আরেকটা দিন কেটে গেল, তুই দেখা দিলি না!' আর দ্বিতীয় পর্বে কেঁদেছিলেন মানুষের জন্য; দক্ষিণেশ্বরে কুঠিবাড়ির প্রাকারে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতেন —'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।' সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল মানুষ। তাঁর কাছে জীবন-সত্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল মানুষ আর ঈশ্বর পৃথক নয়, একই সত্তা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। তাই নরেন্দ্রনাথ-রাখাল-বাবুরামের মধ্যে তিনি যেমন 'নারায়ণ'কে দেখেছিলেন তেমনি 'মা'কে দেখেছিলেন বারাঙ্গনাদের মধ্যেও। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সফিস্টিকেটেড বাবুদের প্রচারিত কঠোর নীতিবাদকে আমল না দিয়ে তাই তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন সমাজের পতিত নর-নারীদের। মাতাল, পতিতা, গুণ্ডা, পাগল—কেউই তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। জীবন ও জগতকে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন, জগত শুধু নিত্যসিদ্ধ

ও ভাল লোকদের নিয়েই গঠিত নয়, এখানে সবরকম মানুষ আছে। জগতকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হলে সবাইকে গ্রহণ করতে হয়। আবার, জীবন তো শুধু কুসুমাস্তীর্ণ পথ নয়, এখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সবই থাকে। তাই তিনি ভাইপো মারা গেলে পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে দেখেন, নিজে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েও 'মা'র কাছে আরোগ্য কামনা করেন না। জীবন সম্বন্ধে এই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—total life-এর প্রবক্তা তিনি। প্রচণ্ড পৌরুষের অধিকারী না হলে মানুষ এই টোটাল্ লাইফকে গ্রহণ করতে পারে না। একদিকে পুরুষসিংহের মতো বীর্যবান নির্ভীক চরিত্র, অন্যদিকে মায়ের মতো অসীম মমতা ও স্নেহ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আন্দোলনের সামাজিক বিন্যাস

রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে যদিও মুখ্যত রামকৃষ্ণ মিশন এগিয়ে নিয়ে গেছে, তবুও এর উৎস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন চর্যা। তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষ তাঁর কাছে এসেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই এই আন্দোলন দানা বেঁধেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যারা আসতেন, বিশেষত তাঁর অনুরাগীরা, এদের সবার নাম পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন বইয়ে অনুসন্ধান করে আমরা দু'শ'র কিছু কম নাম পাই। বর্ণের স্তর বিন্যাসে এদের আনুমানিক হার মোটামুটি এ-রকম—ব্রাহ্মণ শতকরা ২৩·৫ জন, কায়স্থ ২৬·৫ জন, সুবর্ণ বণিক ১৬, বৈদ্য ৫·৫, তপশীল জাতি ২৪·৫, এবং অন্যান্যরা শতকরা ৪ জন। পেশা বা কর্মজীবনের দিক থেকে এদের শতকরা হার—ছাত্র ১৪ জন, সাধু ও ধর্মনেতা ৯·৫, প্রথম শ্রেণীর চাকরীজীবী ৮, জমিদার ৩, বুদ্ধিজীবী ১৯, ব্যবসায়ী ১৫, সমাজসেবী ১১, শিল্পী ৯৫, গৃহবধূ ১৫, এবং অন্যান্য ২।

উপরোক্ত তালিকা থেকে বোঝা যায় যে মূলতঃ নিম্ন-মধ্যবিত্তেরাই তাঁর কাছে বেশি যেতেন। বর্ণের দিক থেকে কায়স্থদের সংখ্যাই ছিল বেশি, ব্রাহ্মণ ও তপশীল জাতি প্রায় সমান। মনে রাখতে হবে এই ব্রাহ্মণদের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। যেমন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্য-নাথ সান্যাল প্রমুখ। ভাটপাড়া, দক্ষিণেশ্বর ও কলকাতার হিন্দু ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে বিশেষ যেতেন না, কারণ শূদ্রাণীর (রানী রাসমণি) চাকরি করায় শ্রীরামকৃষ্ণ 'জাত' হারিয়েছিলেন। বিপরীতদিকে, ইংরেজী শিক্ষার আলো

যাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল সেই ব্রাহ্ম এবং অব্রাহ্মণ হিন্দুদের এক বিরাট অংশ তাঁর কাছে যেতেন। পেশাগত দিক থেকেও বুদ্ধিজীবী-সমাজজীবীরা তাঁর অনুরাগী ছিলেন। অতএব বলা যায়, সংখ্যায় কম হলে বর্ণগত ও ও পেশাগত দিক থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁর কাছে যেতেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে যেমন যেতেন না তাঁর নন্-কমফর্মিস্ট (non-conformist) চরিত্রের জন্য, বিশেষত শূদ্রানীর চাকরী নেওয়া, অহংকার দূর করার জন্য মাথার চুল দিয়ে মেথরের বাড়ির ময়লা পরিষ্কার করা, যেখানে-সেখানে খাওয়া ইত্যাদি ঘটনায় শ্রীরামকৃষ্ণকে তারা 'ম্লেচ্ছ' বলেই মনে করতেন। আবার •জমিদার ও বড়লোকেরা তাঁকে ভাল দৃষ্টিতে নিতে পারেন নি। রাণী রাসমণিকে প্রকাশ্যে চড় মারা, মথুরবাবুর জমিদারীতে বেড়াতে গিয়ে প্রজাদের খাজনা মুকুব করার জন্য জোর করা. কয়েকজন জমিদার ও ভূস্বামী সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিরূপ মন্তব্য করা ইত্যাদি ঘটনাগুলিকে এরা ভাল দৃষ্টিতে নেননি। যে মথুরবাবু তাঁকে এত শ্রদ্ধা করতেন তিনিও তাঁর অবতারত্বে বারবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন (ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলায় তিনি মন্তব্য করেন "অবতার তো দশটির বেশি নেই"। প্রকাশ্য বিচারসভায় পণ্ডিতেরা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অবতারের শাস্ত্রীয় লক্ষণ আছে বলে স্বীকার করলেও মথুরবাবু এ-বিষয়টিকে সহজে মেনে নেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব যারা জোর গলায় স্বীকার করেছেন তারা হলেন চিনু শাঁখারী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, গিরিশ ঘোষ।)

১৮৯৭ সালের ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। মিশনের গোড়ার দিকে যাঁরা এই আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য এবং স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সামাজিক পটভূমিকা দেখা যাক (স্বামীজীর গৃহী শিষ্যদের মধ্যে অনেকেরই নাম পাওয়া যায় না)। এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত ৪৩ জনের ২৮ জনই ছিলেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হবার আগে ১৮ জনই ছিলেন ছাত্র (১২ জন কলেজের, ৬ জন স্কুলের), একজন ছোট ব্যবসায়ী, একজন গৃহভৃত্য, ৭ জন চাকরী করতেন (৪ জন বেসরকারী ও ৩ জন সরকারী অফিসে) এবং একজন সাংবাদিক। ১৫ জন গৃহী ভক্তের মধ্যে অফিসে চাকরী করতেন ৪ জন, ৩ জন ডাক্তার, ১ জন সাংবাদিক, ১ জন বই প্রকাশক, ১ জন জমিদার, ৩ জন শিক্ষক, ও অভিনেতা ২ জন যদিও বেশ কয়েকজনরাজা-মহারাজা স্বামীজীর অনুরাগী ছিলেন, তবুও ক্ষত্রীয়

রাজা ও মহীশূরের রাজাকে বাদ দিলে অন্যেরা এই আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেননি। বস্তুতঃ ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য রামকৃষ্ণ মিশন খুব কম পেয়েছে। কলকাতার প্লেগ-রিলিফে টাকার অভাবে স্বামীজী বেলুড় মঠের জমি বিক্রী করে দিতে চেয়েছিলেন, ১৯০১ সালে মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজো হবার পর ১০ বছর পূজো হয়েছিল ছবিতে, কারণ প্রতিমা কেনার টাকা ছিল না। বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়ি তৈরী করার সময় সারদানন্দজীকে অনেক টাকা ধার করতে হয়েছিল যে-টাকা তিনি শোধ করেছিলেন বই বিক্রী করে, বেলুড়মঠে তখন খাওয়া-পরার খুবই অভাব ছিল—এ-সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে রামকৃষ্ণ মিশন ধনী ব্যক্তিদের সমর্থন বিশেষ পায়নি। এ অবস্থা বর্তমানেও বিশেষ পালটায়নি। ১৯৮০ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, মিশনের বিরাট কর্মযজ্ঞে বার্ষিক যে অর্থ প্রয়োজন হয় তার ১৯.৭% পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের অনুদান হিসেবে, ফিজ্ ও চার্জেস্ থেকে ১১.৫%, ব্যাঙ্ক থেকে সুদ ৪.৯%, বাড়ি-ভাড়া থেকে ২%, বই ইত্যাদি বিক্রী করে ৬.৭%, এবং বাকী ৫৫.২% অর্থ জোগাড় হয় দানের মাধ্যমে (এর মধ্যে ২.২% আসে বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা থেকে, বিদেশী অনুরাগীদের কাছ থেকে ০.৩%, এবং ৫২.৭% জনসাধারণের কাছ থেকে খুচরো দানের মাধ্যমে)। বর্তমানে ভারতের প্রথম সারির ধনী ও শিল্পপতিরা রামকৃষ্ণ মিশনে যে অর্থ সাহায্য করেন তা খুবই নগণ্য, ১%ও নয়। এদের মধ্যে একমাত্র টাটাই মিশনে কিছু দান করেছেন ; তাও কেবল মিশনের জামসেদপুর শাখায়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, প্রথম থেকেই রামকৃষ্ণ আন্দোলনে জনবল ও অর্থবল জোগাচ্ছেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তেরা।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী মোটামুটিভাবে স্থির হয়ে যায়। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় (৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬-৭) দেখা যায়—"উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই-সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।

"ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপান্তর মাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্যের অবতারণা করিয়াছিলেন; তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।

"কার্যপ্রণালী : মনুষ্যের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহ-বর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ-জীবনে যে রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ও পাশ্চাত্যে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর সে-কাজের গতি বাড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে ভারতের কয়েকটি পত্রিকার মন্তব্য দিলেই বোঝা যাবে এই নতুন আন্দোলন কিভাবে লোকজীবনে সাড়া জাগিয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার পত্রিকা ৯-১০-১৮৯৮ তারিখে লেখে—"Service of humanity in the shape of giving alms and building choultries, is also familiar to the Hindu. But the service which Swami Vivekananda appears to have in view is not the charity bestowed on individual men and women, but the service of large masses of humanity, or of humanity in general" পরম বিস্ময়ের সাথে রিফর্মার লেখে : 'রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হল এর অসাম্প্রদায়িক চরিত্র। এদের কিষেণগড় অনাথ-আশ্রমে রয়েছে বালাই, মাঠ, গুজর, মালি, মুসলমান, চামার, রেজার, বারহাই এবং ব্রাহ্মণ ছেলেরা।' (১৫-১২-১৯০১) বালগঙ্গাধর তিলকের মারাঠা পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে লিখলেন : 'রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের দ্বারা প্রমাণিত হল যে বাঙালীরা বাক্‌সর্বস্ব নয়। বেদান্তকে আপাতত যদিও জীবনবিমুখ বলে মনে হয়, কিন্তু তার মধ্যেই আছে শ্রেষ্ঠ কর্মতত্ত্ব।…যাঁর গুরু নিজের মাথার চুল দিয়ে মেথরের পায়খানা মুছে পরিষ্কার করেছিলেন, তিনি যে শহুরে যে-কোন ইহসর্বস্ব নগরপালকের চেয়ে ভালভাবে শহর পরিষ্কার ও প্লেগ নিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে!' (৩০-৪-১৮৯৯) মহারাষ্ট্রের নেটিভ্ ওপিনিয়ন পত্রিকা ১২-৭-১৯০০ তারিখে মন্তব্য করল

—"The Ramakrishna Mission working in the most practical manner for the alleviation of human misery, typifies a fusion of the eastern and western ideals.. the work of the Ramakrishna Mission utterly proves the hollowness of contention that the vedantic system of philosophy preaches a gospel of extreme selfishness." এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে লাহোর ট্রিবিউন লিখল—"It was Vivekananda's genious that gave shape to this new and unique movement of a new school of monks in modern times, though perhaps the force of his revered masters's spirit was behind". (১০-৭-১৯০২)।

উল্লিখিত সামান্য কয়েকটি পত্রিকার উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে আবির্ভাবের সাথে সাথেই রামকৃষ্ণ মিশন জনজীবনে প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। মিশনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের কাছে ধরা পড়েছিল : (১) ধর্মকে জীবনে ব্যবহারিক করে তোলা ; (২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সমন্বয় ; (৩) জাতীয় জীবনে সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দেওয়া , (৪) অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ; (৫) ভারতে নবযুগের সূচনা করা। তবে এটা ঠিক কথা যে সে যুগে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। হরিদ্বার-কাশীর সনাতনী সন্ন্যাসীরা মিশনের সাধুদের 'ভাংগী সাধু' (মেথর সাধু) বলে উল্লেখ করতেন হাসপাতালে ও মহামারীতে সেবাকাজের জন্য। সেইসাথে সনাতনী মতাবলম্বী গৃহীরা এবং কিছু নব্য সংস্কারকও মিশনের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রথমোক্ত দলের অভিযোগ ছিল যে মিশনের সাধুরা নিরামিষ খাওয়া, কীর্তন করা, হাঁচি-টিকটিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অদৃশ্য মহাত্মা ও বাল্যবিবাহে বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয় দলের অভিযোগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করেন না, প্রতিমা-উপাসনা করেন, এবং নব্য সমাজসংস্কারকদের তেমন পাত্তা দেন না। যতদিন গেছে, মিশনের পক্ষে যেমন জোরালো সমর্থন পাওয়া গেছে জনসাধারণের কাছ থেকে, তেমনি বিপক্ষে সমালোচনাও কম হয়নি। এর মধ্যে দুটি বিরাট সমালোচনা মিশনকে বিশেষ বেগ দিয়েছিল—প্রথমটি নিবেদিতা প্রসঙ্গে, দ্বিতীয়টি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দেওয়ায়। এই দুটি প্রসঙ্গ আলোচনা করে দেখা যাক।

নিবেদিতা-প্রসঙ্গ

ভগিনী নিবেদিতা যখন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সরে গেলেন, তখন বেশ কিছু লোক মিশন ও তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ওপর দোষারোপ করা শুরু করলেন। এদের বক্তব্য—রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতার প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেনি। যে কোনো সংগঠনের স্বার্থেই এটা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন যেন রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে না পড়ে। ইতিহাস থেকে তিনি দেখে-ছিলেন যে বৌদ্ধ-খৃষ্টান-মুসলমান ধর্মনেতারা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে কিভাবে ধর্মের ছদ্মবেশে রাজনীতির আমদানী করেছিলেন। স্বামীজীর এই নির্দেশ থাকার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয়ই মিশনের কোন সাধু-ব্রহ্মচারীকে রাজনীতিতে যেতে দিতে পারতেন না! (বর্তমানেও মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা লোকসভা-বিধানসভা ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেন না এ কারণেই।) সুতরাং নিবেদিতা যখন রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে গেলেন, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে 'হয় রাজনীতি কিংবা মিশনের সদস্যপদ' এই নির্দেশ দিয়ে সঠিক কাজই করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, নিবেদিতার সাথে মিশনের সম্পর্ক আইনগতভাবে ছিন্ন হলেও অন্তরের দিক থেকে তা কোনদিনই ছিন্ন হয়নি। নিবেদিতা বেলুড়মঠে প্রায়ই যেতেন· ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সাথে বিভিন্ন প্রসঙ্গের কথা বলতেন, স্বামীজী প্রসঙ্গে নিবেদিতার The master as I saw him বইটি রামকৃষ্ণ মিশন-ই প্রকাশ করেছেন, নিবেদিতার অবর্তমানে তাঁর স্কুলের ভারও মিশনের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন, স্বামীজীর রচনাবলী ইংরেজিতে প্রকাশের সময় তার ভূমিকা লিখে দেবার দায়িত্ব মিশন নিবেদিতার ওপরই দিয়েছিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ নিবেদিতাকে স্বামীজির ইংরেজি জীবনী লিখতে এবং বুদ্ধগয়াতে একটি ইতিহাস-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেন, নিবেদিতার লেখা বইগুলি প্রকাশ করে মিশন এবং নিবেদিতাও মৃত্যুর এক-সপ্তাহ আগে যে উইল করে যান তাতে তিনি তাঁর সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে যান। এতেই বোঝা যায়, রামকৃষ্ণ মিশন বা স্বামী ব্রহ্মানন্দ কখনোই ভগিনী নিবেদিতাকে 'তাড়িয়ে' দেননি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভূমিকা

স্বাধীনতা-সংগ্রামের বছরগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা অনুশীলন-যুগান্তর-বি ভি'র সাথে বা গান্ধীজীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি—এই কারণে মিশনের প্রতি অনেকেই কটূক্তি করেছেন, সমালোচনা করেছেন, এমন-কি এ-কথাও বলেছেন যে মিশন স্বামীজীর পথ থেকে সরে গেছে। এই অভিযোগ সশস্ত্র বিপ্লবীরা তো বটেই, অহিংস সত্যাগ্রহীরাও করেছেন।

আমরা আগেই বলেছি যে স্বামীজী পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন যেন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না থাকে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে মিশন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেনি ঠিকই, কিন্তু তখন তার কর্মধারা কি ছিল? ইতিহাসে দেখি, রামকৃষ্ণ মিশন তখন সমাজসংস্কার ও গণশিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচীতে ব্যস্ত। সারগাছি (পঃ বঙ্গ) আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দ অনুন্নত শ্রেণীর অনাথ বালকদের পড়াশোনা ও হাতের কাজ শেখাচ্ছেন, কেরালায় স্বামী আগমানন্দ জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন চালাচ্ছেন, আসামের পার্বত্যাঞ্চলে স্বামী প্রভানন্দ উপজাতীয় গ্রামগুলিতে একের পর এক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, কাশী ও হৃষীকেশে স্বামী শুভানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ গড়ে তুলেছেন দাতব্য হাসপাতাল, মাদ্রাজে হরিজন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গড়ে উঠেছে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস, বিহারে সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চল-গুলিতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে স্কুল ও কর্মশিক্ষাকেন্দ্র। বস্তুত স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে, অর্থাৎ ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম-ধারার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐ সময়ে প্রায় ৭৩টি শাখাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কোথায় গড়ে উঠেছিল এগুলি? এর শতকরা কুড়িটি কাজ করে যাচ্ছিল পার্বত্যাঞ্চলে—হিমালয়, নীলগিরি পাহাড়, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল, কাছাড়ের পার্বত্যাঞ্চল, সাতপুরা পার্বত্যাঞ্চলের মহাদেব শৈলশ্রেণী ইত্যাদি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে স্কুল, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ইত্যাদি। মাদ্রাজের হরিজন অঞ্চলে, বিহারের সাঁওতাল এলাকায়, পঃ বঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে, ওড়িশার আদিবাসী-অধ্যুষিত বনাঞ্চলে গড়ে তোলা হয়েছে কৃষি ও কুটিরশিল্পের কর্মশিক্ষাকেন্দ্র, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা-কেন্দ্র ইত্যাদি। কলকাতা ও জলপাইগুড়ির বস্তি-অঞ্চলে, বাঁকুড়া ও ডায়মণ্ডহারবারের গ্রামাঞ্চলে, মাদ্রাজ-অন্ধ্র-আসাম-

উত্তরপ্রদেশের নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে পেঁাছে দেওয়া হচ্ছে মাতৃকল্যাণ শিক্ষা ও কর্মসূচী। এরই সাথে চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিতে ব্যাপক ত্রাণকার্য— দুর্ভিক্ষের সময় খাবার ও কাপড় পেঁাছে দেওয়া হয়েছে নোয়াখালি-শ্রীহট্ট-মুর্শিদাবাদ--উড়িষ্যা--কাছাড়--ময়মনসিং--সাঁওতালপরগণা--সৌরাষ্ট্র--রাজস্থান-অন্ধ্রপ্রদেশ-বিহার মধ্যপ্রদেশের দুর্গত মানুষের কাছে; বন্যার সময় সাহায্য পেঁাছে দেওয়া হয়েছে বিহার পঃ বঙ্গ-পূর্ববঙ্গ-আসাম-উড়িষ্যা-কেরালা সৌরাষ্ট্র-অন্ধ্র ইত্যাদি অঞ্চলে; সাইক্লোন-অগ্নিকাণ্ড-মহামারীতে ত্রাণকাজ চলেছে পঃ বঙ্গ-পূর্ববঙ্গ-অন্ধ্র-কেরালা-মহীশূর-উড়িষ্যা-উত্তরপ্রদেশ-হিমাচল-বিহার-মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে ৩০০ বারেরও বেশি ত্রাণকার্য চালানো হয় সব মিলিয়ে। ২০০টিরও বেশি স্কুল-কলেজ, ৫০টির মতো ডিস্পেন্সারী-হাসপাতাল, প্রায় ৪০টি ছাত্রাবাস, ৭০টির মতো গ্রন্থাগার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তুলেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বছরগুলিতে।

উল্লিখিত তথ্যাদি থেকেই বোঝা যায়, সেযুগে রামকৃষ্ণ মিশনই ছিল একমাত্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠান যেটি সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা পেঁাছে দিয়েছিল। অনেকেই এ-কথা জানেন না যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্যাপক ত্রাণকার্য, ব্যাপক গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা (rural housing scheme) এবং গ্রামাঞ্চলে নন-ফর্ম্যাল (non-formal) শিক্ষাবিস্তার—এই তিনটি ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনই পথিকৃত। মিশনের কাজে তখন প্রমাণিত হয়েছিল, ভারতবাসীরা ইচ্ছে করলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই নিতে পারে। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশগঠনের যে একটা পজিটিভ্ দায়িত্ব থাকে তা সশস্ত্র বিপ্লবীরা ও অহিংস সত্যাগ্রহীরা অনেক পরে বুঝেছিলেন। তারাও শেষে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বদেশী দ্রব্য তৈরী, এবং সরকারের সমান্তরাল জনসেবার কাজ চালানোর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন, নেতাজী ও গান্ধীজী এ-দিকে পরে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সে-সময়ে যারা রামকৃষ্ণ মিশনকে সমালোচনা করতেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দেওয়ার জন্য, তাদের দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। তাছাড়া এই কারণে তো রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, রমেশ মজুমদার, বিশ্বেশ্বরাইয়া, সি-ভি রমন্, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীকেও সমালোচনা করা যায়!

জনপ্রিয়তার সামাজিক কারণ

ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা গড়ে উঠছে বহুকাল থেকেই। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুপ্রেরণায় হিন্দু মিলন মন্দির, খৃষ্টান মিশনারীদের উৎসাহে ইয়াং মেনস্ ক্রীশ্চিয়ান এসোসিয়েশন, পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমের আদর্শে বিভিন্ন পাঠচক্রের নাম এ-প্রসঙ্গে করা যায়। এগুলির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবদর্শে গড়ে ওঠা সংস্থার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়াও বিভিন্ন আশ্রম, সেবাসমিতি, ক্লাব, পাঠচক্র ইত্যাদির সংখ্যা কেবল ভারতেই সহস্রাধিক। চৈতন্যদেবের অনুপ্রেরণায় এক সময় বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য হরিসভা স্থাপিত হয়েছিল, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে গড়ে-ওঠা সংস্থাগুলি তেমনিভাবেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ কি? লোকজীবনে এই প্রভাবের পেছনে যে সামাজিক কারণগুলি আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা বিচার করলেই সেগুলি বোঝা যাবে।

প্রথমত, ধর্মীয় আদর্শে সংগঠিত হলেও কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি সাম্প্রদায়িক মনোভাব না দেখিয়ে সব ধর্মের প্রতিই এখানে শ্রদ্ধা জানানো হয় বলে মুসলমান-খৃষ্টানেরাও এগুলিতে যোগ দেয়। মুসলমানদের ঈদ-মিলাদ, খৃষ্টানদের ক্রীসমাস-ঈস্টার, বৌদ্ধদের বুদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনে পালিত হয় হিন্দু উৎসবগুলির মতোই।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় রূপ নিতে চাইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তা পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে বাঙালী সাধুই বেশি, চিন্ময় মিশনে মারাঠীদের ভিড়, ডিভাইন লাইফ সোসাইটিতে তামিলদের, আর্যসমাজে হিন্দীভাষী সাধুরাই প্রধান। বিপরীতদিকে মিশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধুরা থাকায় মিশনের কেরালার শাখাগুলিতে মালয়ালী সাধু, কর্ণাটকে কানাড়ী সাধু, মহারাষ্ট্রে মারাঠী সাধু, পঃবঙ্গে বাঙালী সাধু, গুজরাটে গুজরাটী সাধু থাকছেন কয়েকজন করে। ফলে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি কোন বাধার সৃষ্টি করছে না। এর ফলে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের সুবিধে হচ্ছে। আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য দেওয়াও এর অন্যতম কারণ। মিশনের পঃবঙ্গ শাখাগুলিতে পূজোর ভোগে মাছ দেওয়া হয় কিন্তু পেঁয়াজ নয়, আবার মাদ্রাজে পেঁয়াজকে নিরামিষ বলে গণ্য করা হয় বলে সেখানে

পেঁয়াজ-দেওয়া নিরামিষ ভোগ, কর্ণাটকের শাখাগুলিতে পুজোর ভোগ হিসেবে রসম্, পুরনপুলি ইত্যাদি, গুজরাটে শ্রীখন্ড্—এভাবে আঞ্চলিক খাবার উৎসর্গ করা হয় পুজো ও উৎসবে। এছাড়া আঞ্চলিক ধর্মীয় উৎসব যেমন মহারাষ্ট্রে গণেশপুজো, কেরালায় বিশু, মেঘালয়ে বেদিয়ানখ্লাম্ ইত্যাদি আদিবাসী অনুষ্ঠান, গুজরাটে দ্বারকানাথ উৎসব, পঃবঙ্গে দুর্গাপুজো বাংলাদেশে ঈদ, নাগাল্যাণ্ডে ক্রীস্‌মাস্, এসব অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন অংশগ্রহণ করায় স্থানীয় অধিবাসীরা সহজেই মিশনের সাথে আত্মীয়তা বোধ করে। এসব কারণে রামকৃষ্ণ মিশন তার তত্ত্ব ও ব্যবহারে সর্বভারতীয় চরিত্র প্রকাশ করছে বলে সকলের কাছেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারছে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় রামকৃষ্ণ মিশন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে, যেমন পরিবার-পরিকল্পনার সমর্থন, গোহত্যা বন্ধ আন্দোলনে যোগ না দেওয়া, নারী-স্বাধীনতার সমর্থন করা, বৈজ্ঞানিক সাহায্যে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাকে গ্রহণ করা, অষ্টগ্রহ-মিলন বা সম্প্রতি পৃথিবীর একদিকে সব কটি গ্রহের উপস্থিতিকে পুরণো দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করে শান্তিযজ্ঞ ইত্যাদি না করা, ধর্মীয় কুসংস্কারকে (যেমন বৃহস্পতিবার বারবেলায় কোন কাজ শুরু না করা, মাস-পয়লায় কোথাও না যাওয়া ইত্যাদি) না মানা, ইত্যাদি।

চতুর্থত, মিশনে বহু উচ্চশিক্ষিত সাধু থাকায় (অধিকাংশ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী) বক্তৃতায় বৌদ্ধিক (intellectual) উপাদান ও অবজেকটিভ (objective) দৃষ্টিভঙ্গি থাকে এবং সাধুদের সেক্যুলার বিষয়েও বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা থাকায় বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মিশন সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছে।

পঞ্চমত, রামকৃষ্ণ মিশনে সাধু হিসেবে যোগ দেবার ব্যাপারে কঠিন নিয়ম-কানুন থাকায় কোয়ান্টিটির চেয়ে কোয়ালিটির দিকে নজর রাখা সম্ভব হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ

স্বাধীন ভারতে সেবাকাজের ক্ষেত্রে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রামকৃষ্ণ মিশনই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এখনও এতখানি উদার হতে পারেনি, সেবার মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণ

এদেশে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে, রামকৃষ্ণ মিশন সেটি থেকে মুক্ত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ মোটামুটি তিনটি শাখায় হয়—অন্নদান, বিদ্যাদান, আধ্যাত্মিক সত্যের প্রচার। অন্নদান বলতে ভিক্ষা বোঝায় না; সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে দুঃস্থ মানুষের কাছে খাদ্য-বস্ত্র-গৃহ চিকিৎসার সুযোগ পৌছে দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য। তাছাড়া অনাথ ও প্রতিবন্ধীদের জীবনধারণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করাও পড়ে এর মধ্যে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে মঠ ও মিশনের পরিচালনায় আছে ১৬টি হাসপাতাল, ৭৭টি ডিস্পেন্সারী, এবং ১৫টি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়। গরীবদের কাছে বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পৌছে দেওয়া,অ্যালোপ্যাথিক-হোমিওপ্যাথিক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার ঘটানো ইত্যাদির সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলের ওপর বেশী দৃষ্টি রাখা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণকাজ চালাবার সাথে সাথে পুনর্বাসনের ওপরও জোর দেওয়া হয়। সালে ৮৯টি স্থানে মঠ ও মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ কাজ করেছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পঃ বঙ্গে সহস্রাধিক বাড়ি তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে গুজরাটে ও পঃ বঙ্গে দুর্গতদের জন্য আরও বাড়ি তৈরীর কাজ চলছে। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ নেপালে রামকৃষ্ণ মিশন এক কোটি টাকার এক পরিকল্পনা নিয়েছে দুর্গতদের বাড়ি তৈরী করে দেবার জন্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে ছাত্রাবাস গড়ে তুলে ছাত্রদের পডাশোনার সুযোগ করে দিয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই। সাধারণ নন-ফর্ম্যাল ও কারিগরী শিক্ষার মোট ৬৩৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে মঠ ও মিশনের পরিচালনায় রয়েছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমান প্রায় ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে যাদের মধ্যে ৪০ হাজার হলো তপশীলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের। একটি হিসেবে পাওয়া যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আনুমানিক ৬২% ছাত্রছাত্রীই গরীব ঘরের ছেলেমেয়ে—এদের মধ্যে আনুমানিক ২২% আসে এমন পরিবার থেকে যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। মোটামুটিভাবে বলা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের ৯% উচ্চবিত্ত পরিবারের, ২৯% মধ্যবিত্ত, ৪০% নিম্নবিত্ত এবং বাকীরা দারিদ্র্য সীমার নীচে। এদের মধ্যে ৭১%, ছাত্রছাত্রী বিনাব্যয়ে ও আংশিক ব্যয়ে পড়ার সুযোগ পায়—কলেজগুলিতে ৩৩%, উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৮%, এবং প্রাইমারী ও মিডল স্কুলে ৬৩% অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্টাইপেণ্ডের সংখ্যা আরও

বেশি। আজও ভারতের নানান স্থান, এমন-কি বিদেশী রাষ্ট্রগুলি থেকেও সরকার ও জনসাধারণের কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার জন্য, কিন্তু সীমিত সামর্থের জন্য মিশন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয় না সব ডাকে সাড়া দেওয়া।

শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের লাইব্রেরীগুলিও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। স্কুল-কলেজের লাইব্রেরীগুলি ছাড়াও আছে ১১৫টির বেশি সাধারণ গ্রন্থাগার—শহরাঞ্চলে ৩১টি, মফঃস্বলাঞ্চলে ৩৩টি, এবং গ্রামাঞ্চলে ৫১টির বেশি। অধিকাংশ লাইব্রেরীর সাথেই যুক্ত আছে অবৈতনিক পাঠগৃহ। এছাড়া মোবাইল লাইব্রেরীগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ লোকেরা ঘরে বসেই পড়ার সুযোগ পায়।

ধর্মপ্রচারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত উদার ভাবের প্রতি জোর দেয়। মিশনের সদস্য হতে গেলে যে তিনটি শপথ নিতে হয় তার একটি হলো—আমি সমস্ত ধর্মকেই ঈশ্বরাভিমুখী পথ বলে মনে করি এবং বাস্তব জীবনে আমি সকল ধর্মের অনুসারীদের প্রতি মৈত্রী ও শান্তির ভাব পোষণ করব। ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে মঠ-মিশন থেকে ৮টি ভাষায় ১৩-টি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ঃ ইংরেজীতে ৫টি, বাংলায় ২টি, এবং হিন্দী-মারাঠী-তামিল-তেলেগু-মালয়ালাম ও ফরাসী ভাষায় ১টি করে। এছাড়া ২০০টিরও বেশি অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পত্রিকা বেরোয়। ত্রিশটি প্রকাশনকেন্দ্র থেকে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভাষায় নিয়মিতভাবে বই প্রকাশিত হয়। মঠ মিশন থেকে যে-সব বই বেরোয় তার ৪৯.৭%-এর দাম সাড়ে পাঁচ টাকার নীচে, এবং ৮৮%-এরই দাম ২১ টাকার কম। নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে বই সুলভ করার উদ্দেশ্যেই মঠ-মিশনের বইয়ের দাম এত কম রাখা হয়। গ্রামে-গ্রামে গিয়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জাতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রচারের জন্য রয়েছে ১৫টি ভ্রাম্যমান অডিও-ভিস্যুয়াল শাখা। তাছাড়া সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র, মিউজিয়ম, আর্টগ্যালারী ইত্যাদি শাখাগুলিও সাংস্কৃতিক প্রচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপজাতি ও আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন স্থানে মেলা ও উৎসব সংগঠন করা হয় মঠ-মিশনের পক্ষ থেকে। সঙ্গীত নাটক ছবিআঁকা-সূচীশিল্প ও অন্যান্য কলাবিদ্যা শেখানো হয় ২০টিরও বেশি কেন্দ্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত উদার ধর্মমতের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক তুলে ধরার জন্য

মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর সব মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে; আফ্রিকার মরিশাস, দঃ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, কেনিয়া ও মিশরে; ইওরোপের বৃটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইতালী, গ্রীস, স্পেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি রাষ্ট্রে; দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু, ভেনেজুয়েলা ইত্যাদি রাষ্ট্রে; উত্তর আমেরিকার কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কিউবা, ডেনমার্ক, এশিয়ার জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্রে সন্ন্যাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, তাইওয়ান, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশে সন্ন্যাসীরা নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতে যান এবং ষ্টাডি-সার্কেলের মাধ্যমে কাজ চালান। সম্প্রতি চীনের কমিউনিষ্ট সরকার তাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী চীনা ভাষায় প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

বর্তমানে মঠ-মিশনের ৭৩% কাজই চলছে গ্রামাঞ্চলে। শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ছাড়াও গ্রামের যুবকদের সংগঠিত করে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাদের লাগানোতেও রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ কর্মসূচী অনুসরণ করছে তার বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের জন্য তার বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি শাখার কাজ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বেলুড়মঠ থেকে পল্লীশ্রী ও পল্লীমঙ্গল নামে যে দুইটি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তাতে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্ধ্রপ্রদেশের ১০টি এবং পঃ বঙ্গের ৬টি গ্রামকে নেওয়া হয়েছে। গত দুবছরে ৮২ জন বেকার যুবক এবং ২৭০ জন কৃষককে এ-বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আর্থিক সাহায্য, কারিগরী সহায়তা এবং গবেষণার রিপোর্ট। এই তরুণেরা প্রথমে নিজেদের গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে নিজেরা খোঁজখবর নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করে এবং মিশনের সাহায্যে কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করে। পরে এই পরিকল্পনায় তারা অন্যান্য গ্রামবাসীকেও টেনে আনে এবং সকলে মিলে গ্রামের কৃষি শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রবর্তন করে। দেখা গেছে, এভাবে কৃষকেরা গত দুই বছরে তাদের ফসল তিনগুণ বাড়াতে পেরেছে, মৎস্যচাষ বাড়িয়েছে চারগুণ। এছাড়া ইতিমধ্যেই এরা গ্রামগুলিতে ১০টি নাইট স্কুল ও এডাল্ট এডুকেশন কেন্দ্র শুরু করেছে। ক্ষুদ্র-শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সাথে পোলট্রি, ডেয়ারী এবং ছোটখাট

ব্যবসাও শুরু করতে পেরেছে। মিশনের নরেন্দ্রপুর শাখা ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এ-কাজ করে চলেছে। পঃ বঙ্গের পাঁচটি জেলায় ৮৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮০০ গ্রামে উক্ত শাখা যে কাজ করছে তা কেবল ভারতেই নয়, রাষ্ট্রসংঘেও প্রশংসিত হয়েছে, যার ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকার তাদের শিক্ষার্থীদের নরেন্দ্রপুরে পাঠান বিশেষ ট্রেনিংয়ের জন্য। নাইটস্কুল খোলা, উন্নত প্রথায় কৃষি, মাছচাষ, পোলট্রি, ডেয়ারীর সাথে সাথে বিভিন্ন গ্রামীন কুটিরশিল্প, টালি তৈরী, ছাতা তৈরী, কাঠের কাজ, মৃৎশিল্প ইত্যাদির সাহায্যে কয়েক হাজার গ্রামবাসী নারী-পুরুষ এবং বেকার যুবক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন নরেন্দ্রপুরের সাহায্যে। রাঁচীর দিব্যায়ন শাখার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন আদিবাসী উপজাতীদের মধ্যে এই ধরণের কাজ করছেন। ৮০০টি গ্রামকে তাঁরা সেখানে কর্মসূচীতে গ্রহণ করে নরেন্দ্রপুরের মতোই কাজ করছেন। ফলে শিক্ষাপ্রাপ্ত আদিবাসী ও উপজাতির লোকেরা তাদের ফসল বাড়াতে পেরেছেন তিনগুণ, এবং সেইসাথে বিভিন্ন কুটিরশিল্পের পত্তন করে এবং নাইট স্কুল খুলে গ্রামোন্নয়নের কাজে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছেন। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর শাখায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার যুবকেরা তাঁতশিল্প, বেতের কাজ, ছোট যন্ত্রশিল্পের পত্তন করার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে স্কুল, টিউবওয়েল, পাম্প, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি নিজেরাই স্থাপন করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য হল গ্রামবাসীদের প্রাথমিকভাবে সাহায্য দিয়ে তাদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস, কর্মকুশলতা ও সংগঠনী শক্তির জাগরণ ঘটানো। এভাবে গ্রামবাসী-দের চেতনায় পরিবর্তন এনে তাদের দিয়েই গ্রামোন্নয়ন ঘটানোই মিশনের লক্ষ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা যেমন পঃ বঙ্গে নরেন্দ্রপুর, রামহরিপুর, পুরুলিয়া, সরিষা, সারগাছি, মনসাদ্বীপ ও সারদাপীঠ, তামিলনাড়ুতে মাদ্রাজ, নটরাজপল্লী ও কোয়েম্বাটুর, কেরালায় তিরুভাল্লা ও ত্রিচুর, অরুণাচলে আলং ও তিরাপ, আসামে শিলচর, মেঘালয়ে চেরাপুঞ্জি, গুজরাটে রাজকোট, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর, ওড়িশায় পুরী, রাজস্থানে খেত্রী, বিহারে রাঁচী ইত্যাদি আশ্রমগুলি গ্রামোন্নয়ন ও যুব-সংগঠনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে। এভাবেই রামকৃষ্ণ আন্দোলন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।